দাম ঃ ৬.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা।। ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ সোমবার, ৮ ডিসেম্বর, ২০০৮।।

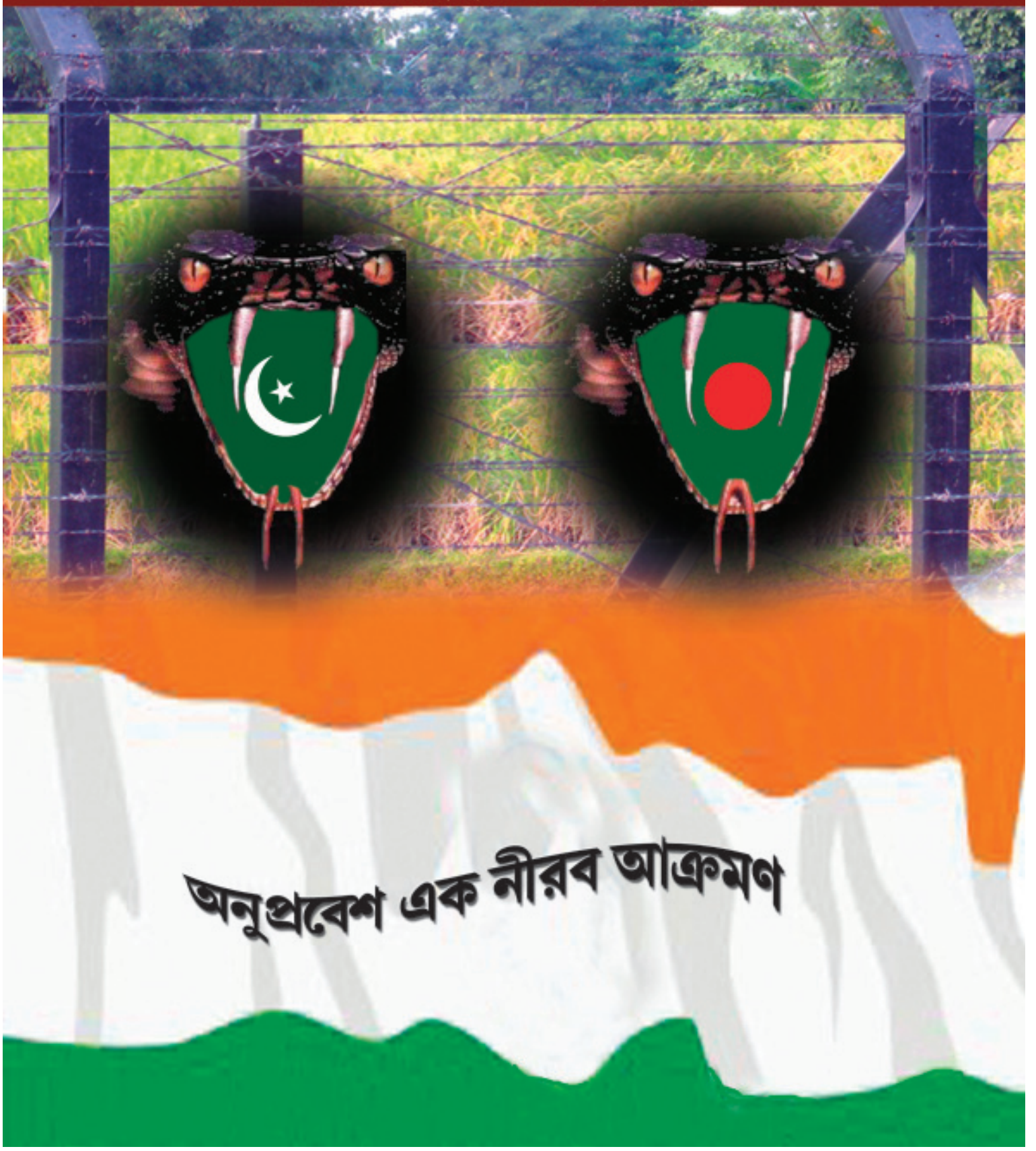

অনুপ্রবেশ এক নীরব আক্রমণ

মুম্বাই-এ জঙ্গি হানা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ — শ্রীসুদর্শন

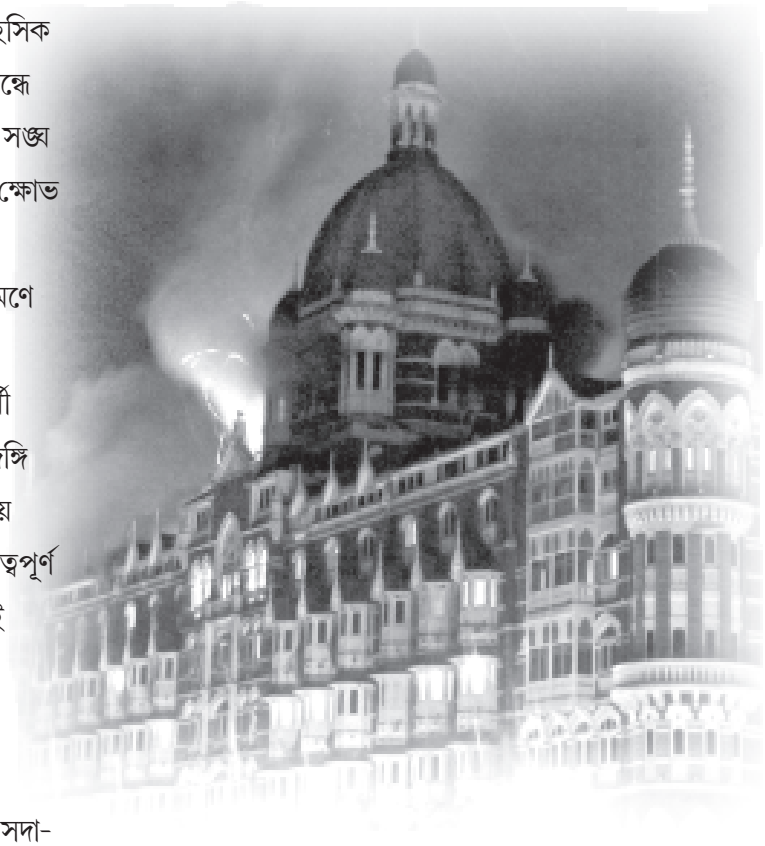

মুম্বাইয়ে দুঃসাহসিক জঙ্গি আক্রমণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একই সঙ্গে গভীর ক্ষোভ এবং শোক প্রকাশ করছে। এই আক্রমণে শতাধিক নিরীহ জনসাধারণ এবং বেশ কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন। এই আক্রমণের ব্যাপকতা, জঙ্গি দের সংখ্যা, প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসা, মুম্বাই-এর মতো শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আক্রমণ শুধুমাত্র জঙ্গি আক্রমণ নয়, এই ঘটনা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ।

জঙ্গিদের উদ্দেশ্য খুবই পরিস্কার — তারা দেশের শান্তি, সৌহার্দ্য এবং জাতির নৈতিক মনোবলকে ধবংস করতে চায়। আর এস এস সদা-সর্বদাই আমাদের রাষ্ট্রের সেইসব শত্রু যারা জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র এবং সভ্যতাকে বিনষ্ট করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। সঙ্কটের এই মুহূর্তে সরকার এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলির প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সম্পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে। সঙ্ঘ সকল দেশবাসীকে একজোট হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের এই দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

আমি সকল স্বয়ংসেবকদের সর্বতোভাবে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহায়তা করার আহ্বান জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে সরকারি প্রচেষ্টা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয় সেজন্য স্বয়ংসেবকদেরকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারি এজেন্সিগুলি যেন দেশের যে কোনও স্থানে যে কোনও সময় যেতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এই জঘন্য জঙ্গি হামলার ফলে যারা নিহত হয়েছেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে গভীর শোক প্রকাশ করছি। যে সকল বরিষ্ঠ নিরাপত্তা অফিসার — হেমন্ত কারকারে, বিজয় সলাসকর এবং অশোক কামতে সহ এই জঙ্গি দমনে যাঁরা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

(মুম্বাইয়ে জঙ্গি আক্রমণ সম্পর্কে আর এস এস প্রধান কে এস সুদর্শনজীর বিবৃতি— দিল্লী, ২৭-১১-০৮)

স্বস্তিকা

৬১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা,
২২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১০
৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ এক নীরব আক্রমণ

কাশ্মীরে এখন যেসব জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ চলিতেছে তাহা যেমন বহু বছর আগে তৈরি নকশা অনুযায়ী, তেমনই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একাংশ কুক্ষিগত করিয়া বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনাও নতুন নয়। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অতীতে ভারতবর্ষকে স্থায়ীভাবে জয় করা সম্ভব হয় নাই এবং আগামী দিনেও তাহা সম্ভব নয় বুঝিয়া পাকিস্তান ও তাহার আন্তর্জাতিক ঐশ্লামিক সহযোগীরা নীরব আক্রমণের পদ্ধতি গ্রহণ করে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধির পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ এবং হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ পদ্ধতিটিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় বুঝিয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে মুসলিম অনুপ্রবেশ পদ্ধতিটিকে নীরব আক্রমণের প্রধান অস্ত্র হিসাবে বাছিয়া লওয়া হয়। মুসলিম ভোটের উৎকোচ দিয়া এদেশের প্রতিটি মেকী ধর্মনিরপেক্ষ দল এবং মিডিয়ার একাংশকে কিনিয়া লইয়া ভারতবর্ষের উপর এই 'ডেমোগ্রাফিক ওয়ার' চালানো হইতেছে। কংগ্রেস, জনতা, প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি এবং মেকী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম ভোটের জন্য এমন হীন কাজ নাই যাহা করিতে না পারে। অনুপ্রবেশকে শুধু সমর্থন নয়;পুলিশ, বি এস এফ এবং প্রশাসনকেও এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

বি এস এফ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটি। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীতে ভরিয়া গিয়াছে। এই জেলাগুলিতে রোজ শত শত বাংলাদেশী মুসলিম সীমান্ত পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিতেছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা মূর্তিমান সন্ত্রাস। দশ হইতে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল হিন্দুশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল কার্যত বাংলাদেশে পরিণত হইয়াছে। আর শহরে এবং নিরাপদ স্থানে বসিয়া কংগ্রেস কমিউনিস্ট সহ মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বুলি আওড়াইতেছে। ইহা অপেক্ষা ভন্ডামি বেইমানি ও আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী হইতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষে যেদিন মুসলিম জনসংখ্যা একান্ন শতাংশ হইবে সেইদিনই পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষ ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার প্রভৃতি বড় বড় বুলি শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। হিন্দুদের অবস্থা বর্তমানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো দুর্বিসহ হইবে। ইহা চলিতে থাকিলে একটি হিসাব অনুসারে ২০৬০ সালের মধ্যেই সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু কথা হইল, ইস্রায়েল ও মায়ানমারের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যদি দেশবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং মৌলবাদী মুসলিম সমস্যার সমাধান করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা পারিব না কেন? যে কারণে আমরা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করিতে পারি না, আমাদের দেশেও সেই একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে হইবে। জাগ্রত সমাজই একমাত্র এই মোকাবিলা করিতে পারে। দেশের শাসকগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগরণে ও সমস্যার মোকাবিলায় তৎপর হইতে বাধ্য করিতে পারে। ইহা ব্যতীত এই নীরব আক্রমণের মোকাবিলার অন্য পথ নাই।

অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে শাসক দল ও সেইসঙ্গে জাতিকে স্বস্তিকা যে প্রথম থেকেই সতর্ক করে আসছে তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরানো পৃষ্ঠা থেকে একটি সম্পাদকীয় (১৯.১১.১৯৭৯) তুলে ধরা হল।

— সঃ স্বঃ

সত্যের মুখোমুখি হোন!

সি পি আই (এম) কে একটা সোজা কথা বলার দিন আসিয়াছে যে, যদি সদিচ্ছার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে ফন্দিবাজী ছাড়িয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়ান — সত্য কথা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করুন। আসাম পরিস্থিতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম) মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্প্রতি এক জরুরী বার্তা পাঠাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এই জরুরী বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলিয়াছেন যে — আসাম পুলিশ বাংলা ভাষাভাষীদের তাড়াইয়া দিতেছে এবং তাহাদের ঘরবাড়িও পুড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু এই আসাম পুলিশের সম্যক পরিচয় বা এই বিতাড়িত বঙ্গভাষাভাষী বিশেষতঃ কাহারা তাহা কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানেন না? যদি জানেন তো ভাবের ঘরে চুরি করিতেছেন কেন?

যাহা সত্য যাহা স্পষ্ট তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলুন। পার্টি বাজি — ধোঁকাবাজি তো অনেক হইয়াছে, তাহাতে লাভ হইয়াছে কি? তাহা যদি হইতো তবে যুক্তফ্রন্টের অপমৃত্যু ঘটিত না। সেই ধোঁকাবাজি একমাত্র অবলম্বন হইলে বর্তমান বামফ্রন্টেরও একই হাল হইবে।

পার্টি বাজ সিপি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কি একথা জানেন না যে, শুধু আসাম নহে — ভারতের সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চল ব্যাপিয়া বিভেদাত্মক নীতির এক ভয়াবহ খেলা চলিয়াছে। কেবলমাত্র আসাম হইতে অন-অসমিয়াই নয়, মণিপুর হইতে অ-মণিপুরী, মিজোরাম হইতে অ-মিজো ও নাগাল্যান্ড হইতে অ-নাগা বিতাড়নের এক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা সক্রিয়ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। সমস্যা হিসেবে কোনটাই আলাদাভাবে আজ আর দেখিবার অবকাশ নাই। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল জুড়িয়া একটা সুনির্দিষ্ট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আজ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী একদা যাহা স্পষ্টভাবে বলিতে পারিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল পার্টির মুখ্যমন্ত্রী সেই সত্য প্রকাশ-এর সাহস রাখেন না এটাই হইল দুঃখের কথা।

ফ্রন্ট খাড়া করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পরে ত্রিপুরায় সরকার গঠনের পর সিপিআই (এম)-এর পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল আসাম। বলাইবাহুল্য একথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পর তাহারা আসাম সম্পর্কে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরিকল্পনা মতো অগ্রসর হওয়ার কাজও চলিতেছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তাঁহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। এতদঞ্চলে এই ঘটনা নূতন নহে। বেশ কিছুকাল ধরিয়া পরিকল্পনা মাফিক এই দুষ্কর্ম চলিয়া আসিতেছে। ক্ষমতায় না থাকুন তখন বিশিষ্ট বিরোধী পক্ষে জ্যোতি বসুরা ছিলেন — কবে কোন্ সূত্রে বা কোন সময়ে তাঁহারা ইহার জোরালো প্রতিবাদ করিয়াছে?

এই সংবাদ ইতিপূর্বে আমরা দিয়াছি যে, বহু বাংলাদেশী মুসলমান আসামে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। এই সংবাদও দেওয়া হয়েছে যে, কোনও এক অদৃশ্য অঙ্গুলির খেলায় বাংলাদেশীয় বহু অনুপ্রবেশকারী আসাম পুলিশে ঢুকিয়াছে। তাহাদের অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের অদ্ভুৎ কার্যকলাপের সংবাদও প্রকাশ করা হইয়াছে। শত্রুপক্ষের কাগজ বলিয়া যদি জ্যোতি বসু সেইদিক হইতে চোখ ফিরিয়া রাখেন তাহার জন্য দায়ি কে? জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাই তিনি অবশ্যই বঙ্গভাষা-ভাষীদের কথাই বলিবেন। কিন্তু একথা অবশ্যই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষা-ভাষী বলিয়া যাহারা আসাম হইতে বিতাড়িত হইতেছে এবং আসাম পুলিশ যাহাদের ঘর-বাড়ি পোড়াইয়া দিতেছে তাহাদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতজন আছে? বঙ্গভাষাভাষী বলিতে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের বোঝায় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বোঝায় না এমনতো নয়। এই প্রশ্নের সদুত্তর যদি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এবং কোনরূপ বিকার না রাখিয়া যদি সত্যকে শিকার করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে কাজের কাজ হইতে পারে। এতদঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারী চক্রান্ত ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিরাময় করিতে না পারিলে মূল সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত— ইহাই হইল স্পষ্ট কথা। এই অদৃশ্য অঙ্গুলির কারসাজি এখানে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এই জিগির তোলার চক্রান্তকারী। গত দুটি সংখ্যাতেও আসাম পরিস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি প্রতিবেদন আমরা প্রকাশ করিয়াছি। শত্রুপক্ষের কাগজ বলিয়া এলার্জির প্রশ্রয় না দিলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেটি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিতে পারেন। অন্ততঃ দেখিলে যে কিছুটা আসল সত্যের মুখোমুখি হইবেন তাহা বলা যায় — অবশ্য যদি তিনি তাহা চান।

১৯ নভেম্বর, ১৯৭৯

দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্য

স্বস্তিকা

৩১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ॥ ১৮ই কার্তিক সোমবার, ১৩৮৬ ॥ দাম ৬০ পয়সা ॥ কলকাতা ও আগরতলা হতে প্রকাশিত

সীমান্তরক্ষীদের চোখের সামনেই ব্যাপক অনুপ্রবেশ চলেছে

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

দলত্যাগীদের দল লোকদল এখন পশ্চিমবঙ্গে অকূল পাথারে পড়েছে

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

দলত্যাগীদের দল লোকদল এখন অকূল পাথারে। যেমন কেন্দ্রে, তেমনই এই রাজ্যে।

অদ্ভুত এই বামফ্রন্ট সরকার ! খাদ্য নিয়ে কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের দুই কথা

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

দুই জুয়াড়ির উমেদারি করছেন সি পি এম-এম এল এ

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

স্বস্তিকায় ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে প্রকাশিত অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সংবাদের প্রতিলিপি

অনুপ্রবেশ — ফিরে দেখা

তথাগত রায়

গত প্রায় তিন দশক ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিবিধ ক্ষেত্রের বেশ কিছু সংগঠন অনুপ্রবেশ নিয়ে সোচ্চার। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে যে অনুপ্রবেশ নিয়ে আমজনতার ধারণা এখনও পরিষ্কার হয়নি এবং এর বিষময় ফল সম্বন্ধে চৈতন্যোদয় হয়নি। মেকি-সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলো আগে এর অস্তিত্বই অস্বীকার করত — এখন অতটা করতে পারে না, তফাৎ শুধু এটুকুই। কিন্তু এ ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি করতে তারা এখনো সচেষ্ট। কেউ কেউ বলে, ওরা অনুপ্রবেশকারী নয়, "অর্থনৈতিক শরণার্থী"। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথাটা যেটা মেকি-সেকুলারদের মাথায় সতত বিরাজমান, মাঝে মাঝে মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে, তা হল "অনুপ্রবেশ চলছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু করা অসম্ভব"।

এখন প্রশ্ন, "অনুপ্রবেশকারী" বা হিন্দিতে "ঘুসপেটিয়া" কারা? (এখন থেকে আমরা ঘুসপেট শব্দটিই ব্যবহার করব)। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ডিঙিয়ে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া যারা আসে তারা সবাই ঘুসপেটিয়া নয় — তাদের মধ্যে শরণার্থীরাও আছে। তাহলে প্রশ্ন, কে শরণার্থী, কে ঘুসপেটিয়া? এই ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা আছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) কৃত — সেটি মেনে নিতেই হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী

'A Refugee is a Person who is outside the country of his nationality owing to a well-foundeded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country."

অর্থাৎ, শরণার্থী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতে বাধ্য হয়েছে এই বাস্তবসম্মত ভীতি থেকে, যে দেশে থাকলে সে তার জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব, কোনও রাজনৈতিক দলের বা কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যতার কারণে অত্যাচারিত হতে পারে। এবং তখন সে তার নিজের দেশের সরকারের সাহায্য নিতে ইচ্ছুক হবে না।

এই সংজ্ঞা বিজেপি বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ঠিক করে দেয়নি। এই সংজ্ঞা তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা UNHCR এবং এই সংজ্ঞাকে সব দেশ মানে। সংজ্ঞাটি এক বার পড়লেই একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেটা হল, পেটের দায়ে যারা এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায় তারা আর যাই হোক, "শরণার্থী" নয়।

আর একটু মন দিয়ে পড়লে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে প্রায় এক কোটি হিন্দু অত্যাচারিত

হয়ে ভারতে চলে এসেছেন তাঁরা সবাই শরণার্থী। এদের সঙ্গে কিছু বৌদ্ধ এবং খৃস্টানও আছেন, তাঁরাও শরণার্থী। ভারতরাষ্ট্র এদের আগাগোড়াই আশ্রয় দিয়ে এসেছে — ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত মুসলমান ভারতে ঢুকেছে তারা তো অত্যাচারিত হয়ে ঢোকেনি! তসলিমা নাসরিন, সালাম আজাদ সদৃশ হাতে গোণা কিছু অত্যাচারিত মুসলিমের কথা আলাদা। অতএব মুসলমানরা শরণার্থী নয়, ঘুসপেটিয়া। "অর্থনৈতিক শরণার্থী" বলে কিছু হয় না — এটা সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো জিনিস।

এর থেকে আবার দুটি প্রশ্ন জন্মগ্রহণ করে। প্রথম কথা, ভারত রাষ্ট্র যদি শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছিল তা দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল — ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আবার কী হল! আর দ্বিতীয়, মুসলিম বেচারারা যদি পেটের দায়ে ঢোকে তা হলে মানবিক কারণে কি আমাদের উচিত নয়, তাদের আশ্রয় দেওয়া? আমাদের নরম সেকুলার কবি ও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (যদিও হিন্দু হবার অপরাধে পিতৃভূমি মাদারিপুর থেকে বিতাড়িত) এইরকম কিছু আবেদন একবার রেখেছিলেন।

প্রথম প্রশ্নটায় পরে আসছি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তরে আমার প্রতিপ্রশ্ন— বলুন তো পাশের দেশের মানুষের অতিরিক্ত জনসংখ্যার দায় আমি নেব কেন? আমার দেশে তো দুধ ও মধুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে না। আমার দেশেও তো অনাহারে মৃত্যুর বা অপুষ্টির কারণে শিশুমৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। তাহলে আমার দেশ কেন চোর-এর দায়ে ধরা পড়েছে? বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ তো মায়ানমার (বর্মা) -ও আছে, সেখানে জনসংখ্যার চাপ ভারতের তুলনায় অনেক অনেক কম। তারা সেখানে যাক্ না! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মায়ানমার এরকম কোনও সুযোগ দেয় না — বৌদ্ধ মায়ানমার মুসলমান বাংলাদেশীদের মেরে তাড়ায়। পৃথিবীর ধনীতম দেশের মধ্যে একটি সৌদি আরব, সেখানে তো জনসংখ্যা নগণ্য, সেখানে যাক্ না! এই অতিরিক্ত জনসংখ্যাপীড়িত ভারত কেন বাংলাদেশীদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন অতিরিক্ত প্রজননক্ষমতার প্রয়োগের ভার নেবে।

পৃথিবীর কোনও দেশে এরকম ঘুসপেটিয়ারা আশ্রয় পায় না। শুধু ভারতে পায়। কারণ — মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক! তার জন্য মেকি সেকুলার রাজনৈতিক নেতারা ইমামের জুতো চেটে পরিষ্কার করে দিতেও রাজি।

এবার ২০ মার্চ ১৯৭১ প্রসঙ্গে আসি। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বা গৃহ মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনামা পাঠিয়ে এই তারিখের পরে আসা বাংলাদেশীদের শরণার্থী সংজ্ঞা দিতে নিষেধ করেছিল। বিজেপি তার বিরোধিতা করেছিল এবং এখনো করে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চেন্নাই-তে অনুষ্ঠিত বিজেপি-র জাতীয় কার্যকারিণী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে পরিষ্কার বলা আছে, যে বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু, খৃস্টান প্রভৃতিকে শরণার্থী হিসাবে ধরতে হবে এবং তাদেরকে ভারতে থাকবার অধিকার দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মেকি সেকুলাররা প্রচার করে থাকে যে এন ডি এ সরকার থাকাকালীন নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে, বিজেপি অত্যাচারিত বাংলাদেশী হিন্দু শরণার্থীদের আবার বাংলাদেশে ফেরৎ যাবার ব্যবস্থা করেছে। এই কথা সর্বৈব মিথ্যা। বিজেপি দাবি করে এবং এখনও দাবি করছে যে ১৯৭১ সালের নির্দেশনামা খারিজ করা হোক্।

এই প্রবন্ধে যে অনুপ্রবেশকারী বা ঘুসপেটিয়া — আর কে ঘুসপেটিয়া নয় তা নিয়েই শুধু আলোচনা হল। ইচ্ছা রইল বারান্তরে ঘুসপেটিয়াদের নিয়ে কি করা যায় সেই বিষয়ে লিখবো। ●

ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত

পাকিস্তান	৩৩২৩ কিলোমিটার
আফগানিস্তান	১০৬ কিলোমিটার
ভূটান	৬৯৯ কিলোমিটার
চীন	৩৪৮৮ কিলোমিটার
বাংলাদেশ	৪০৯৬.৭ কিলোমিটার
মায়ানমার	১৬৪৩ কিলোমিটার
নেপাল	১৭৫১ কিলোমিটার

অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের বড় বিপদ

বিমল প্রামাণিক

বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর ও মতামত থেকে একটি বিষয় ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশে উগ্র ইসলামী মৌলবাদী শক্তির একটি শক্ত ভিত ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রবল অস্তিত্বের প্রকাশ বাংলাদেশের মুক্তমনা সুশীল সমাজকেও আতঙ্কিত করে তুলেছে। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তালিবানি ইসলামের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার যে চেষ্টা নববইয়ের দশকেই শুরু হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে। একথা আর কোনও গোপন বিষয় নয়। আফগানিস্তান, কাশ্মীর, প্যালেস্টাইন, লেবানন প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী মুজাহিদগণ দলে দলে দেশে ফিরে আসার ফলে বাংলাদেশে ইসলামী জেহাদের সমর্থক রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলি প্রধানত ২০০১ সাল থেকে অতি দ্রুত শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে গজিয়ে উঠতে থাকে মসজিদ-মাদ্রাসা-এন জি ও কেন্দ্রিক ছদ্মবেশে উগ্র জেহাদি বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, খতমে নবুয়ুত, শাহাদত-ই-আল হিকমা, হরকাতুল জেহাদ, হিজবুত তাওহিদ, জামা-আতুল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ, শাহাদাত-ই-নবুয়ত, আল জিহাদ বাংলাদেশ, আল-মারকাজুল-আল ইসলামী, হরকাতুল-এ-ইসলাম, আল জিহাদ সহ পঁচাত্তর-আশিটি উগ্র মৌলবাদী ও সশস্ত্র সংগঠন আজ সারা দেশব্যাপী সক্রিয় রয়েছে। আর এসব অনেক সংগঠনের সঙ্গেই সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক এবং ভারতের নানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। যারা প্রধানত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় এবং শক্তিধর। তাছাড়া ভারতীয় সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী অঞ্চলগুলিতে, সেদেশের শাসকবর্গের জ্ঞাতসারে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেটওয়ার্ক এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা কিনা একদিকে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সাহায্য সহযোগিতা ও অন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে চলেছে। আর অন্যদিকে ইসলামী জেহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে।

এদিকে গত সাড়ে তিন দশকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের যে চরিত্র দেশবিভাগের পরে ষাটের দশক পর্যন্তও বজায় ছিল, তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি ছোট-বড় মুসলিম অঞ্চল বা এলাকা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে বা হচ্ছে। যেমন, উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম নিয়ে একটি বড় মুসলিম অঞ্চল তৈরি হয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনার তথ্যানুযায়ী, এই অঞ্চলের জনসংখ্যার হিন্দু ও মুসলিম অংশ যথাক্রমে ৪৯.৯৪ শতাংশ ও ৪৯.৩১ শতাংশ। আরও উল্লেখ্য যে, ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম শিশু গোষ্ঠী (০-৬ বছর) অংশ যথাক্রমে ৪২.৯৫ শতাংশ ও ৫৬.২৯ শতাংশ। জনসংখ্যার অংশ সমান সমান হলেও ০-৬ বছর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পার্থক্য ১৩ শতাংশের অধিক। ২০২০ সালে ওই জনগোষ্ঠীর বয়স হবে ২০-২৬ বছর। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৫১ সালে এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অংশ ছিল ৫৯ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ মাত্র। গত পঞ্চাশ বছরে (১৯৫১-২০০১) হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল যথাক্রমে ২০.৬ ও ৩৪.২ শতাংশ। দেশ বিভাগজনিত কারণে বিরাট সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তুদের ওই অঞ্চলে

আগমনের পরও হিন্দু জনবৃদ্ধির হার মুসলিম জনবৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। (যদিও উদ্বাস্তু-শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন এবং বসতি স্থাপন ১৯৪৭সাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে)। এখানে উল্লেখ্য, উক্ত পাঁচটি জেলার সন্নিহিত বিহার রাজ্যের বর্তমান চারটি জেলা— পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ ও আরারিয়া, যা ১৯৮১-১৯৯১ সালের মধ্যে পূর্ণিয়া জেলা বিভক্তিকরণের ফলে তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে ৪৫ শতাংশের অধিক। ১৯৫১ সালে অবিভক্ত পূর্ণিয়া জেলায় মুসলিম জনসংখ্যার অংশ ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। এই অঞ্চলেও ব্যাপক বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে একদা বসবাসকারী বিহারী মুসলিমের সংখ্যাও কম নয়। ইতিমধ্যেই বৃহত্তর মুসলিম অঞ্চল (মুসলিম বাংলা) গড়ার ডাক দিয়েছে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন। এছাড়াও নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চবিবশ পরগণা এবং হাওড়া জেলায় ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট মুসলিম অঞ্চল। দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা-উত্তর গত পাঁচ দশকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৯৮.৫৪ শতাংশ ও ৩১০.৯৩ শতাংশ। ফলে হিন্দু জনসংখ্যার অংশ ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ ৭৮.৪৫ শতাংশ থেকে ৭২.৪৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম জনসংখ্যার অংশ ১৯.৮৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.২৫ শতাংশ-এ পৌঁছেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি জেলারই গত পাঁচ দশকে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ বা ততোধিক। যেমন, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা প্রভৃতি জেলা। ব্লক পর্যায়ের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। বিপুল সংখ্যক ব্লকে (Block) মাত্র এক দশকেই (১৯৮১-১৯৯১) হিন্দু জনবৃদ্ধির হারের চেয়ে শুধু দ্বিগুণ নয়, বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলিম জনবৃদ্ধির হার। যেমন জলপাইগুড়ির ১৩টির মধ্যে ৯টি ব্লকে। কোচবিহারের সবগুলি ব্লকে, বীরভূমের ১৯টির মধ্যে ৯টিতে, দক্ষিণ চবিবশ পরগণার ২৯ টির মধ্যে ২১ টিতে সহ অন্যান্য জেলায়। এর ফলে ব্লক পর্যায়ের জনবিন্যাসে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। যেমন, দক্ষিণ চবিবশ পরগণার মগরাহাট ১ ও ২ নং ব্লক। ১৯৮১ সালে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অংশ ছিল ৮৭.৬৩ শতাংশ ও ১০.৮৫ শতাংশ। ১৯৯১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫১.২০ শতাংশ ও ৪৭.৩১ শতাংশ। বৃদ্ধির হার হিন্দু ও মুসলিম যথাক্রমে —২২.৯৭ শতাংশ ও ৪৭৫.১৪ শতাংশ। হিন্দু বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক অর্থাৎ এ ব্লক থেকে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুর বহির্গমন ঘটেছে। ১৯৮১ তে নলহাটি ২ নং ব্লকে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অংশ ছিল যথাক্রমে ৫৬.৩৪ ও ৪৩.২৩ শতাংশ। ১৯৯১-তে দাঁড়িয়েছে ৪৭.৬২ শতাংশ ও ৫১.৭৬ শতাংশ। ঐ দশকে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৯৯ শতাংশ ও ৫১.৫৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩৪১ টি সিডি ব্লকের মধ্যে শতাধিক ব্লকে জনবিন্যাসে এ ধরনের ওলোট-পালট ঘটে গেছে। আর এই ধরনের পরিবর্তনের প্রধান কারণই হলো গত তিন দশকের অব্যাহত ব্যাপক বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ।

কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়কালে, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চ মাত্রায় জনবৃদ্ধির কারণ স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যদি না ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বা বহির্দেশ থেকে সেই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বা অভিবাসন ঘটে থাকে। দেখা যাচ্ছে, উক্ত সময়ে, ভারতের অন্য রাজ্য বা প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত মানুষের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ/অভিবাসনের তুলনায়। যা হোক, দীর্ঘমেয়াদী অনুপ্রবেশের ফলে পিছিয়ে পড়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে সেখানে দ্রুত মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মুসলিম মৌলবাদী শক্তির বাড়-বাড়ন্ত সম্পর্কিত নানা খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। দেশ বিদেশের ইসলামী সন্ত্রাসাবাদী তথা জেহাদি ক্যাডারদের উক্ত অঞ্চল একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লী-কাশ্মীর-অযোধ্যা-মুম্বই-বাঙ্গালোর প্রভৃতি সন্ত্রাসী হামলার সূত্র অনুসন্ধানেও এই 'নিউ ইসলামিক জোন' ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তথা বাংলাদেশী আগুনখেকো জেহাদি নেতাদের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও পুস্তকাদি প্রচুর সংখ্যায় এই অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-ঝাড়খণ্ড নিয়েও একটি ইসলামী মৌলবাদী নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করেছে। গত ১৭ আগস্ট ২০০৫-এ বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে পাঁচ শতাধিক বোমা হামলা ও পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসলামী জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অনেক তথ্য আমাদের সামনে এসেছে। তা থেকে একথা বলার সময় এসেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার নিয়ে যে 'নিউ ইসলামিক জোন' গঠন হয়েছে— সেখান থেকেও ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর নিকট ভবিষ্যতেই বড় আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে।

(স্বস্তিকা ঃ দীপাবলী সংখ্যা ৩০.১০.২০০৬)

যেসব অজুহাতে ঢুকছে অনুপ্রবেশকারীরা

- শ্রমিক হিসাবে কাজের খোঁজে।
- ভালোচিকিৎসারনামে।
- মাদ্রাসায়পড়াশোনারউদ্দেশ্যনিয়ে।
- বৃত্তিবাপেশাগতকারণকেসামনেরেখে।

জনগণনা এবং হিন্দু সচেতনতা

এস গুরুমূর্তি

ভারতবর্ষে এই প্রথম জনগণনার রিপোর্ট ধর্মীয় পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রকাশিত হল। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশজুড়ে মুসলিম জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এই দশকে এই বৃদ্ধির হারটা শতকরা ৩৬ ভাগ, কিংবা বিতর্কিত ভাবে শতকরা ২৯ ভাগ, যাই হোক না কেন, বিষয়টি আজ জাতীয় জীবনের কাছে কঠিন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদের একত্রে বৃদ্ধির হারটা যখন খুব বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশও ছিল, তখনও কোনও বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু মুসলিমদের এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের চোখে ক্রমশ ফুটে উঠছে তাহল, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই এই ভারতীয় ধর্মগুলির আচরণকারীরা একটু একটু করে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। অঙ্কের হিসাব স্পষ্ট করে দিচ্ছে বা বলছে যে, ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মীয়রা প্রতি দশকে কিভাবে কমে আসছে তাদের এই চিরাচরিত বাসভূমিতে। ১৯৫১ তে তারা ছিল শতকরা ৮৭.২৪ ভাগ। ১৯৬১ তে ৮৬.৮৭ ভাগ। ১৯৭১-এ ৮৬.৬০ ভাগ, ১৯৮১ তে ৮৫.৮৬ ভাগ এবং ১৯৯১ তে ৮৫.০৯ ভাগ। বর্তমানে ২০০১-এ আমরা দেখলাম এই হারটা নেমে শতকরা ৮৪.২১ ভাগে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে মুসলিম জনসংখ্যা কিন্তু বেড়েছে। তাদের হার ১৯৫১ তে শতকরা ১০.৪৩ ভাগ ছিল। বর্তমানে ২০০১-এ সেটা বেড়ে হয়েছে ১৩.৪৩ ভাগ। অর্থাৎ হিন্দুদের হ্রাসটা যেখানে ৩.০৩ ভাগ, মুসলিমদের সেখানে হ্রাস তো নয়ই, বৃদ্ধির হারটা শতকরা ৩.০০ ভাগ। যেটা সংখ্যাগত দিক থেকে হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে ওঁরা ৩.৭৬ কোটি থেকে বেড়ে ১৩.৮২ কোটিতে পৌঁছেছে। আরও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে যে সারা দেশের তুলনায় এই বৃদ্ধিটা মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চ লগুলোতেই ঘটেছে। একটু তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পশ্চিমে অবস্থিত পাকিস্তান হল ঘোষিত মুসলিম রাষ্ট্র। পূর্বে বাংলাদেশ, তারাও অঘোষিত ইসলামী রাষ্ট্র।

১৯৪৭ সাল নাগাদ পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুর সংখ্যাটা যেখানে শতকরা ১১ ভাগ ছিল তা বর্তমানে ১ ভাগেরও কমে এসে ঠেকেছে। অপরদিকে বাংলাদেশে যেখানে গত চারদশক আগে হিন্দুর সংখ্যাটা শতকরা ২৯ ভাগ ছিল, সেখানে বর্তমানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ হিন্দু রয়েছে। এসবের পরিণামও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্যের কারণে পাকিস্তান আজ পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র। বাংলাদেশও প্রায় তাই। এরকম শোচনীয় ঘটনা কিভাবে ঘটল সেজন্য সীমান্তের ওপারে তাকানোর প্রয়োজন নেই। গত পাঁচ দশক আগের চিত্রটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখবো যে অখণ্ড ভারত আবার খণ্ডিত হল শুধুমাত্র এই ধর্মীয় জনসংখ্যাগত হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্যের কারণে। তবুও হিন্দু 'জিন'-এর (ডি এন এ) কাছে জনসংখ্যাগত ধ্যান ধারণা এখনও অপরিচিত। ধর্মভিত্তিক জনগণনা হল খৃস্টান ও ইসলামের তত্ত্বগত প্রকাশ। তাই হিন্দুদের কাছে

এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার যে গুরুত্ব খৃস্টান ও মুসলিমরা আবিষ্কার করেছিল, হিন্দুরা কখনও তা জানত না এবং কখনও দেখেনি। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ধর্মীয় বিশ্বাসেরই একটা অঙ্গ যা থেকে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা নির্ধারণের ধ্যান ধারণার সূত্রপাত। আর এর পরিণামে ভূগোল এমনকি জাতির ইতিহাস অবিশ্বাস্য ভাবে বদলে গেছে।

চেন্নাই-এর 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' (সি পি এস) নামে এক গবেষণা সংস্থা এই প্রথম ভারতবর্ষে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যাগত চিত্রটি তুলে ধরেছে। অবিভক্ত ভারতকে একটি ভৌগোলিক একক হিসাবে গ্রহণ করে সিপিএস দেখিয়েছে যে, বিশ শতকের প্রথম নয় দশকে এই উপমহাদেশে ভারতীয় ধর্মগুলির অনুসরণকারীর সংখ্যা ১১ শতাংশ কমে গিয়েছে। সিপিএস ভারতীয় সংবিধানের সিভিল ল' অনুসারে স্বীকৃত সকল হিন্দু, শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধ দের ভারতীয় ধর্মীয় বলেই উল্লেখ করেছে। সর্বশেষ জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, এরা সকলেই ক্রমহ্রাসের মুখে। বস্তুত নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি র এই গতিপ্রকৃতি দেখে হিন্দুদের গভীর উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা সারা পৃথিবীতে হিন্দুদের নিজেদের জন্য যে ভূভাগ আবহমান কাল থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা কিন্তু এই ভারতবর্ষই। বর্তমান বিশ্বে ১৬টি দেশ রয়েছে যেগুলো পুরোপুরিভাবে মুসলিম প্রধান। এছাড়া আরও অনেকগুলির শাসনতন্ত্র তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। এইসব ইসলামী রাষ্ট্রে অ-ইসলামীরা তাদের ধর্মীয় আচার আচরণ গুলো সম্মানের সঙ্গে এবং স্বাভাবিক ভাবে পালন করতে পারে না। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলি যদি দূর মনে হয়, তাহলে একটু কাছের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে তাকানো যেতে পারে যেগুলি কিছুদিন আগেও হিন্দুস্থানের অঙ্গ ছিল। আজ সেখানে বসবাসকারী হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় আচার আচরণগুলো পালন করতে রীতিমত ভয় পায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে যতটুকু হচ্ছে তাও ওদেরই ইচ্ছা ও মর্জিকে মান্যতা দিয়ে।

ইরানের দিকে দেখুন, যাদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দা অবিস্তা' যাকে পঞ্চ ম বেদ বলে উল্লেখিত করা হত, কিংবা আফগানিস্তান যেখানে গান্ধারীর জন্মস্থান। ইরাক যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম পুনর্জীবন লাভ করেছিল। এইসব দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ রা যে সহাবস্থান করতেন তার বহু নিদর্শন ধ্বংসস্তুপগুলিতে পাওয়া যায়। অত দূরে কেন, কাশ্মীরের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, তা আজ পুরোপুরি ইসলামে পরিবর্তিত। সেখানে আজ হিন্দুরা নিশ্চি হ্ন হতে চলেছে এবং তা 'সেকুলার' ভারত এবং তার সংবিধানের আওতাতেই! তাই ইসলামিক জনসংখ্যাগত আক্রমণে সংবিধানও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ইসলামিক ঐতিহ্য যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছেদ করে, এটা অন্তত স্পষ্ট— তা অতীতের কোনও গল্প নয়। তাই খুব সঙ্গত কারণেই হিন্দুরা খুব উদ্বেগ বোধ করছে। যদি এরপরেও হিন্দুরা না ভাবে তাহলে তারা ভেসে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেকুলাররা কখনই এনিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না, বরং তারা খুশিই হবে। এমন মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক যদি অনুপ্রবেশের মাধ্যমেও পুষ্ট হয় তাহলেও এই সেকুলাররা তাদের শুধু রাজনৈতিক মূলধন হিসেবেই দেখবে। এই রকম ঘটনা হিন্দুদের কাছে আবার দুঃখজনক হতে চলেছে। ইতিহাসই বলছে, দেশের কোনও অঞ্চ লে যখনই হিন্দুর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, তখনই সেই অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিচ্ছেদই নয় সামগ্রিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষও। এই কথাটার সত্যতা আজ ফুটে উঠেছে গান্ধারীর আফগানিস্তানে। যেখানে ২০০ বছর আগেও মহারাজা রণজিৎ সিং শাসন করেছিলেন। কথাটা একইভাবে সত্য কয়েকবছর আগের পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। এমনকি, আজকের কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও। একই রকম সত্য ঘটনা হল, যেখানে মুসলিমরা নিয়ন্ত্রক সেইসব অঞ্চ লকে এই সেকুলাররা মুসলিমদের রাজ্য বলে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নেয়। মার্কসবাদীরা যারা নিজেদের খাঁটি সেকুলার বলে জাহির করে, তারাই মুসলিমদের জন্য কেরলে মালাপুরম জেলা তৈরি করে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে একটি অঞ্চ লে ইসলামিক চরিত্রকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদেরকে 'সেকুলার' বলে দাবি করে এবং এরাই অন্যদের 'সাম্প্রদায়িক' বলে গাল দেয়। তাই আমরা দেখছি অসম থেকে পশ্চি মবঙ্গ পর্যন্ত কিভাবে জেলার পর জেলায় জনসংখ্যার চিত্রটা পাল্টে যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হল বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে।

ইসলামিক ঐতিহ্য মেনে বাংলাদেশ অধিকাংশ হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে। তারা এখন ভারতে উদ্বাস্তু। এখনও সেই ধারা বজায় আছে। এখন বাংলাদেশ থেকে ভারতে মুসলিমরা অনুপ্রবেশ করেই চলেছে। বিশেষত অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চ লের জেলাগুলিতে দিনের পর দিন বেআইনিভাবে মুসলিমরা ঢুকছে। জেলার পর জেলা মুসলিম বহুল হয়ে যাচ্ছে। বিতর্ক শুধু একটাই—তাদের সংখ্যা এক কোটি না দু কোটি? পাকিস্তান আনবিক বোমাগুলো ভারতের দিকে লক্ষ্য করে সাজিয়েছে। এটা বিপজ্জনক বটে তবে তার চাইতেও বেশি ভয়াবহ হল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। বাংলাদেশ থেকে আগত এই জনবিস্ফোরণের (মাস হিউম্যান বম্বস্) ফলে ভারতের মধ্যেই বহুস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে।

এটা আজ জনচরিত্রের প্রশ্ন তো বটেই। কিন্তু কেবল এইটুকুই শেষ নয়। এখন এটা নিরাপত্তারও ইস্যু। সেদিনের বাংলাদেশ আজ ইসলামী বাংলাদেশে রূপ নেওয়ার ফলে শুধু যে সীমান্ত অঞ্চ ল বা ভারতে অবৈধ কার্যকলাপ চলছে তাই নয়, বিশ্ব ও স্থানীয় জেহাদের জন্য বাংলাদেশ এখন জঙ্গি সংগ্রহ, অনুপ্রবেশ এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। জেহাদের জন্য সংগ্রহ করা মাত্র কয়েক হাজার জঙ্গি শুধু ভারতের পক্ষে নয়, বিশ্বের পক্ষেও ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। অথচ এই রকম একটি নিরাপত্তার ইস্যুকে কিছুতেই জাতীয় বিতর্কে আনতে রাজি নয় সেকুলাররা।

'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতি যদি মুসলিমদের রক্ষাকবচ হয়, তাহলে কি সেটা তাদের পক্ষে ভালো নয়? স্পষ্টতই, না। ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব

অস্ত্রের চোরাকারবার

●এদেশ থেকে বিভিন্ন অগ্নেয়াস্ত্র অবৈধভাবে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে অবাধে।

কখনই টিকে থাকবে না যদি না হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে। সামান্য সংখ্যক হিন্দুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা ধর্মনিরপেক্ষতা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। একমাত্র নিরাপদ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ধর্মনিরপেক্ষতার সংরক্ষক হতে পারে। এ কারণেই জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ সঠিক কাজই হয়েছে। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান (তৎকালীন) তারলোচন সিং মুসলিমদের পরিবার পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এটা প্রকৃত বন্ধুর মতো প্রস্তাব। যারা তাদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করে এমন সেকুলার শোষকের মতো নয়। সত্য কথাটিকে এভাবে স্পষ্ট করার জন্য তারলোচন সিংকে ধন্যবাদ। এখন কিছু প্রগতিশীল মুসলিম নেতৃত্ব এন সি এম প্রধানের পরামর্শকে কার্যকর করার জন্য এগিয়ে আসবেন কি?

২০০১ সালে ভারতবর্ষে রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যার তারতম্য (শতকরা হারে)

রাজ্য	হিন্দু সংখ্যা	হার	মুসলিম সংখ্যা	হার	খৃস্টান সংখ্যা	হার
জম্মু-কাশ্মীর	৩০,০৫,৩৪৯	২৯.৬০	৬৭,৯৩,২৪০	৬৭.০০	২০,২৯৯	২.৩০
হিমাচল প্রদেশ	৫৮,০০,২২২	৯৫.৪০	১,১৯,৫১২	২.০০	৭,৬৮৭	০.১০
পাঞ্জাব	৮৯,৯৭,৯৪২	৩৬.৯০	৩,৮২,০৪৫	১.৬০	২,৯২,৮০০	১.২০
চণ্ডীগড়	৭,০৭,৯৭৮	৭৮.৬০	৩৫,৫৪৮	৩.৯০	৭,৬২৭	০.৮০
উত্তরাঞ্চ ল	৭২,১২,২৬০	৮৫.০০	১০,১২,১৪১	১১.৯০	২৭,১১৬	০.৩০
হরিয়ানা	১,৮৬,৫৫,৯২৫	৮৮.২০	১২,২২,৯১৬	৫.৮০	২৭,১৮৫	০.১০
দিল্লী	১,১৩,৫৮,০৪৯	৮২.০০	১৬,২৩,৫২০	১১.৭০	১,৩০,৩১৯	০.৯০
রাজস্থান	৫,০১,৫১,৪৫২	৮৮.৮০	৪৭,৮৮,২২৭	৮.৫০	৭২,৬৬০	০.১০
উত্তরপ্রদেশ	১৩,৩৯,৭৯,২৬৩	৮০.৬০	৩,০৭,৪০,১৫৮	১৮.৫০	২,১২,৫৭৮	০.১০
বিহার	৬,৯০,৭৬,৯১৯	৮৩.২০	১,৩৭,২২,০৪৮	১৬.৫০	৫৩,১৩৭	০.১০
সিকিম	৩,২৯,৫৮৪	৬০.৯০	৭,৬৯৩	১.৪০	৩৬,১১৫	৬.৭০
অরুণাচল	৩,৭৯,৯৩৫	৩৪.৬০	২০,৬৭৫	১.৯০	২,০৫,৫৪৮	১৮.৭০
নাগাল্যাণ্ড	১,৫৩,১৬২	৭.৭০	৩৫,০০৫	১.৮০	১৭,৯০,৩৪৯	৯০.০০
মণিপুর	৯,৯৬,৮৯৪	৪৬.০০	১,৯০,৯৩৯	৮.৮০	৭,৩৭,৫৭৮	৩৪.০০
(সেনাপতি জেলার মাও-মারান, পাওমাতা এবং পারুল মহকুমা বাদে)						
মিজোরাম	৩১,৫৬২	৩.৬০	১০,০৯৯	১.১০	৭,৭২,৮০৯	৮৭.০০
ত্রিপুরা	২৭,৩৯,৩১০	৮৫.৬০	২,৫৪,৪৪২	৮.০০	১,০২,৪৮৯	৩.২০
মেঘালয়	৩,০৭,৮২২	১৩.৩০	৯৯,১৬৯	৪.৩০	১৬,২৮,৯৮৬	৭০.৩০
অসম	১,৭২,৯৬,৪৫৫	৬৪.৯০	৮২,৪০,৬১১	৩০.৯০	৯,৮৬,৫৮৯	৩.৭০
পশ্চিমবঙ্গ	৫,৮১,০৪,৮৩৫	৭২.৫০	২,০২,৪০,৫৪৩	২৫.২০	৫,১৫,১৫০	০.৬০
ঝাড়খণ্ড	১,৮৪,৭৫,৬৮১	৬৮.৬০	৩৭,৩১,৩০৮	১৩.৮০	১০,৯৩,৩৮২	৪.১০
ওড়িশা	৩,৪৭,২৬,১২৯	৯৪.৪০	৭,৬১,৯৮৫	২.১০	৮,৯৭,৮৬১	২.৪০
ছত্তিশগড়	১,৯৭,২৯,৬৭০	৯৪.৭০	৪,০৯,৬১৫	২.০০	৪,০১,০৩৫	১.৯০
মধ্যপ্রদেশ	৫,৫০,০৪,৬৭৫	৯১.১০	৩৮,৪১,৪৪৯	৬.৪০	১,৭০,৩৮১	০.৩০
গুজরাট	৪,৫১,৪৩,০৭৪	৮৯.১০	৪৫,৯২,৮৫৪	৯.১০	২,৮৪,০৯২	০.৬০
দমন-দিউ	১,৪১,৯০১	৪৯.৭০	১২,২৮১	৭.৮০	৩,৩৬২	২.১০
দাদরা-নগর-হাভেলি	২,০৬,২০৩	৯৩.৫০	৬,৫২৪	৩.০০	৬,০৫৮	২.৭০
মহারাষ্ট্র	৭,৭৮,৫৯,৩৮৫	৮০.৪০	১,০২,৭০,৪৮৫	১০.৬০	১০,৫৮,৩১৩	১.১০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬,৭৮,৩৬,৬৫১	৮৯.০০	৬৯,৮৬,৮৫৬	৯.২০	১১,৮১,৯১৭	১.৬০
কর্ণাটক	৪,৪৩,২১,২৭৯	৮৩.৯০	৬৪,৬৩,১২৭	১২.২০	১০,০৯,১৬৪	১.৯০
গোয়া	৮,৮৬,৫৫১	৬৫.৮০	৯২,২১০	৬.৮০	৩,৫৯,৫৬৮	২৬.৭০
লাক্ষাদ্বীপ	২,২২১	৪.০০	৫৭,৯০৩	৯৫.০০	৫০৯	১.০০
কেরল	১,৭৮,৮৩,৪৪৯	৫৬.২০	৭৮,৬৩,৮৪২	২৪.৭০	৬০,৫৭,৪২৭	১৯.০০
তামিলনাড়ু	৫,৪৯,৮৫,০৭৯	৮৮.১০	৩৪,৭০,৬৪৭	৫.৬০	৩৭,৮৫,০৬০	৬.১০
পণ্ডিচেরি	৮,৪৫,৪৪৯	৮৬.৮০	৫৯,৩৫৪	৬.১০	৬৭,৬৮৮	৬.৯০
আন্দামান-নিকোবর	২,৪৬,৫৮৯	৬৯.২০	২৯,২৬৫	৮.২০	৭৭,১৭৮	২১.৭০

সূত্র ঃ ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট (অসংশোধিত)

জনগণনা বৃদ্ধির হার (শতকরা)

সাল	ভারত (জনসংখ্যা)	বৃদ্ধি	হিন্দু	বৃদ্ধি	মুসলিম	বৃদ্ধি	খৃস্টান	বৃদ্ধি
১৯৯১	৮৩,৮৫,৬৮,০০০	২৭.২১	৬৮,৭৬,৪৭,০০০	২৫.০৯	১০,১৫,৯৬,০০০	৩৩.৭৭	১,৯৬,৪০,০০০	২১.৪৩
২০০১	১০২,৮৬,১০,০০০	২২.৬৬	৮২,৭৫,৭৮,০০০	২০.৩৫	১৩,৮১,৮৮,০০০	৩৬.০২	২,৪০,৮০,০০০	২২.৬১
(অসংশোধিত)								

সাল	ভারত	বৃদ্ধি হার	পশ্চিমবঙ্গ					
১৯৫১	৩৬,১০,৮৮,০০০	—	২,০৬,৫৬,০০০	২৯.৩০	৫১,১৮,০০০	২৫.২৬		
১৯৬১	৪৩,৯২,৩৫,০০০	—	২,৭৫,২৩,০০০	৩৩.২৪	৬৯,৮৫,০০০	৩৬.৪৮		
১৯৭১	৫৪,৮১,৬০,০০০	২৪.৮০	৩,৪৬,১১,০০০	২৫.৭৫	৯০,৬৪,০০০	২৯.৭৬		
১৯৮১	৬৮,৩৩,২৯,০০০	২৪.৬৬	৪,২০,০৭,০০০	২১.৩৭	১,১৭,৪৩,০০০	২৯.৫৬		
১৯৯১	৮৩,৮৫,৬৮,০০০	২৭.২১	৫,০৮,৬৭,০০০	২১.০৯	১,৬০,৭৫,০০০	৩৬.৮৯		
২০০১	১০২,৮৬,১০,০০০	২২.৬৬	৫,৮১,০৪,০০০	১৪.২২	২,২৫,০৫,০০০	৪০.০০		
(অসংশোধিত)								

সূত্র ঃ ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট (অসংশোধিত)

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলায় জনসংখ্যার তারতম্য (শতকরা হার)

জেলা	ধর্ম	১৯৯১ জনসংখ্যা	হার	২০০১ জনসংখ্যা	হার	বৃদ্ধি হার
নদীয়া		৩৮,৫২,০৯৭	—	৪৬,০৪,৮২৭	—	—
	হিন্দু	২৮,৬৩,৮৯১	৭৪.৩৫	৩৩,৯৬,০৯৫	৭৩.৭৫	১৮.৫৪
	মুসলিম	৯,৫৯,৯৯৮	২৪.৯২	১১,৭০,২৮২	২৫.৪১	২১.৯০
	খৃস্টান	২৬,৬৭৪	০.৬৯	২৯,৫৬৩	০.৬৪	১০.৮৩
উঃ ২৪ পরগণা		৭২,৮১,৮৮১	—	৮৯,৩৪,২৮৬	—	—
	হিন্দু	৫৪,৯৫,২১৪	৭৫.৪৬	৬৭,২১,৪২০	৭৫.২৩	২২.৩১
	মুসলিম	১৭,৫৯,৮৩৮	২৪.১৭	২১,৬৪,০৫৮	২৪.২২	২২.৯৭
	খৃস্টান	১৪,৬৪৫	০.২০	২০,১৩৮	০.২৩	৩৭.৫১
দঃ ২৪ পরগণা		৫৭,১৫,০৩০	—	৬৯,০৬,৬৮৯	—	—
	হিন্দু	৩৯,৫০,৪৯৬	৬৯.১২	৪৫,৪৮,৪৫৯	৬৫.৮৬	১৫.১৪
	মুসলিম	১৭,১১,২৯৭	২৯.৯৪	২২,৯৫,৯৬৭	৩৩.২৪	৩৪.১৭
	খৃস্টান	৪৮,৯৪১	০.৮৬	৫২,৮৩৫	০.৭৬	৭.৯৬

সূত্র ঃ ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট (অসংশোধিত)

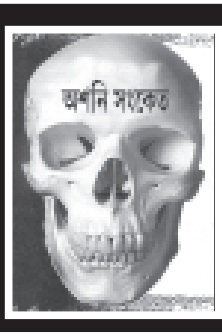

ড্রাগ পাচারের অবাধ কারবার

- বার্ষিক ৩৫০ কোটি টাকার ড্রাগ পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে।
- এই কাজে দেশের যুব সমাজকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে তারা।
- এর সঙ্গে এক বিশাল পাচারচত্র(যুক্ত(রয়েছে।

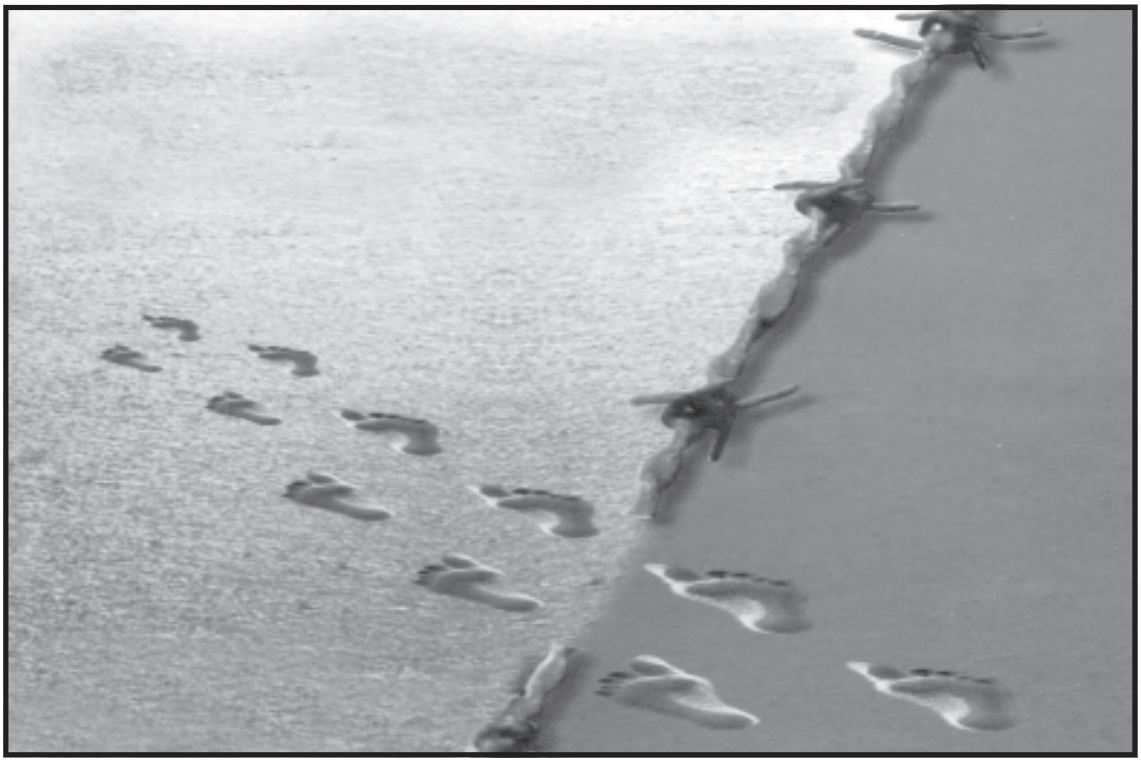

অনুপ্রবেশ এক নীরব আক্রমণ

গূঢ়পুরুষ

আজ থেকে তিন বছর আগে ২০০৫ সালের ১২ জুলাই ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, 'অনুপ্রবেশ আসলে ভারতভূমি দখলের জন্য বহিরাগতদের আক্রমণ। এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেসন। ভারত আক্রান্ত। এখনই প্রতিরোধ করা না হলে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।' কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার সুপ্রিম কোর্টের হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করেছে। এরপর ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে বাংলাদেশ থেকে কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়েছে। তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো হোক। মনমোহন সিং সরকার সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশও ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে। কেন? উত্তর জানতে আমাদের কয়েক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে।

১৯৯৬ সাল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের প্রধান টি. ভি. রাজেশ্বর রাও ভারত সরকারকে দেওয়া একটি গোপন রিপোর্টে জানালেন যে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে এবং নিম্ন অসমের পাঁচটি জেলায় গোপনে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। এদের লক্ষ্য বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠন করা। এই ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ সরকার ও পাক গোয়েন্দা এজেন্সি আই এস আই-এর মদত আছে। শ্রীরাও পরে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই রিপোর্টটি ফাইল বন্দি করে রেখে দেয়। এরপর কেন্দ্রে দেবগৌড়া প্রধানমন্ত্রী হন। অসমে তখন বাংলাদেশী বিতাড়নের দাবিতে উত্তাল গণ-আন্দোলন চলছে। গণ-আন্দোলনের ঢেউতে চড়ে কংগ্রেসকে হঠিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে প্রফুল্ল মোহান্ত — ভৃগু ফুকনের নেতৃত্বে অসম গণ পরিষদ দল। সেটা ছিল ১৯৯৮ সাল। এই আন্দোলনের চাপে দেবগৌড়া সরকার বাধ্য হয়ে তখনকার অসমের রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এস. কে. সিন্‌হাকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে

বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেন। প্রায় এক বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৯৯-তে রাজ্যপাল একটি ৪২ পাতার রিপোর্ট তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণকে দেন। এই রিপোর্টে তিনি রাজেশ্বর রাওয়ের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে বলেন, অসমে ৪০ লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬০ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী স্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছে। এদের লক্ষ্য অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়া। ইতিমধ্যেই নিম্ন অসমের চারটি জেলাকে তারা মুসলিম গরিষ্ঠ করেছে। উত্তরবঙ্গেরও চারটি জেলায় এরা জন-অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। রাজ্যপাল সিন্‌হার রিপোর্টের সমর্থন পাওয়া যায় ২০০১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে। দেখা যায় যে সিন্‌হার চিহ্নিত জেলাগুলিতে মাত্র দশ বছরে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের ষড়যন্ত্রটি বুঝতে ভারতে মুসলিম আগ্রাসনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া দরকার। ৭১১ খৃস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরব হানাদাররা ভারত দখলের জন্য আক্রমণ করে। এর আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ একমাত্র হিন্দুদেরই বাসভূমি ছিল। এরপর ১২০০ বছর ধরে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে ভারতে ইসলামি আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। ইসলামকে হঠিয়ে খৃস্টান বৃটিশ রাজশক্তি ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত শাসন করে। ইংরেজ রাজত্বে ধীরে ধীরে হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির উত্থান শুরু হয়। এই উত্থানে শঙ্কিত মুসলিম নেতারা হিন্দু বিরোধী মুসলিম লিগ ১৯০৬ সালে গড়ে। স্বাধীনতাকামী হিন্দুদের দমন করতে বৃটিশ রাজশক্তি লিগকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। লিগের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতে পুনরায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা সম্ভব নয় বুঝে ১৯৪৬ সালে লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি করে। জিন্নার বক্তব্য, মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার ব্যবহারে পৃথক ও পরস্পর বিরোধী। একজন সাচ্চা মুসলমান কখনও হিন্দু কাফেরদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে পারে না। সুতরাং ভারতের মুসলিমগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিকে নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান গঠন করতে হবে। বৃটিশ-রাজও জিন্নার দাবি মেনে নেয়। কংগ্রেস দল প্রথমে এই দাবি মেনে না নেওয়ায় লিগ দেশজুড়ে জাতি দাঙ্গা শুরু করে ১৯৪৭ সালে দেশভাগে বাধ্য করে। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে মুসলিম পাকিস্তান গঠিত হয়। আজ মিডিয়া ও কংগ্রেস দল হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিচ্ছে। যদি সত্যিই হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদ ও হিংসায় বিশ্বাসী হতো তবে ভারত ভাগ সম্ভব ছিল না। ভারতে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে লিগের বিনাশ ঘটতো। দুঃখের বিষয় ভারতে বসবাসকারি মুসলিমরা ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে এককাট্টা হয়ে পাকিস্তান গঠনের জন্য জিন্নার প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পর এই মুসলিম ভোটদাতাদের একটা বড় অংশ পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতেই থেকে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করে। এর অর্থ অন্য ধর্মের মানুষ পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতাই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ঘোষণা করায় ভারতভূমিতে সর্ব ধর্মের মানুষ সমমর্যাদায় বসবাসের অধিকারী। ভারতের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতিকে পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই দুর্বলতা বলে মনে করে এসেছে।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানেরা আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খান সেনাদের অভূতপূর্ব দমন-পীড়ন গণহত্যা শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়। গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এইসময় একটা ধারণা ছিল যে, শেখ সাহেব ভারত-বন্ধু হবেন। ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু তা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অল্প পরেই তিনি পাকিস্তানের বন্ধু হয়ে যান। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লেখক সালাম আজাদ তাঁর "State of Minorities in Bangladesh : From Secular to Islamic Hegemony" প্রবন্ধে খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন যে, বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই দেশের প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মৌলবাদী ইসলামিকরণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মীয় গোঁড়ামির শিক্ষা কেন্দ্র ছিল সেখানের ইসলামিক আকাদেমি। এই আকাদেমির ধর্মগুরু মৌলবি মৌলানারাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উদারচেতা লেখক অধ্যাপকদের নির্মমভাবে হত্যার জন্য খান সেনাদের প্ররোচিত করেছিল। ১৯৭৫ সালে মুজিবর রহমানের সরকারি নির্দেশে এই ঘাতক ইসলামিক আকাদেমিকে জাতীয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন করা হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার লড়াইয়ের সময় শেখ সাহেব তাঁর ভাষণ শেষ করতেন জয় বাংলা বলে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েই তিনি জয় বাংলা ভুলে যান। তাঁর ভাষণে আল্লা, ইনসা আল্লা, বিসমিল্লা, তোওবা ইত্যাদি আরবি বাক্যের ফুলঝুরি ছুটতে শুরু করে। ভাষণ শেষ করতেন খোদা হাফিজ বলে। শেখ সাহেবের অনুরোধে পাক সরকার ঢাকায় দূতাবাস খোলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নরহত্যাকারি রাজাকারদের "রাষ্ট্রীয় ক্ষমা" ঘোষণা করেন। প্রতিদানে পাকিস্তান বাংলাদেশকে "ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কে'র সদস্যপদ পেতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ইসলামিকরণের সেটাই ছিল প্রথম ধাপ। শেখ মুজিবর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই লিখেছেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আরও জমি ও খনিজ সম্পদ প্রয়োজন। একমাত্র অসমসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করলে তা পাওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে পূর্ব পাকিস্তান গঠনের পর মুসলিম লিগ নেতারাও ঠিক একই দাবি করেছিল। এই হচ্ছে অনুপ্রবেশ সমস্যার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

১৯৯৮-৯৯ সালে রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণকে জমা দেওয়া অসম রাজ্যপালের রিপোর্টটি ধামা চাপা দেওয়া হয়। কারণ অজ্ঞাত। অনেকেই ভেবেছিলেন বিজেপি-র নেতৃত্বে আসা এন ডি এ সরকার অনুপ্রবেশ বন্ধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু তা হয়নি। যাইহোক, অসমের অসম গণ পরিষদের নেতা সর্বানন্দ সোনোওয়াল রাজ্যপাল সিনহার রিপোর্টের উপর কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি জানতে

চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থমূলক মামলা করেন। ২০০৫ সালের ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে অনুপ্রবেশকে বহিরাগতদের নিঃশব্দ আক্রমণ বলে বর্ণনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্ট এইসঙ্গে রাজীব গান্ধী সরকারের জারি করা কুখ্যাত IMDT Act টিকে বাতিল করে দেয়। এই আইনটি কেবলমাত্র অসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলে অনুপ্রবেশ সমস্যাটি শুধুমাত্র অসমেরই নয়। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, রাজস্থান, মুম্বাই সর্বত্র অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গেড়ে বসবাস করছে।

তা'ছাড়া এই বিশেষ আইনে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়নে বিস্তর আইনি বাধা আছে। যেমন, পুলিশ এবং প্রশাসনকে তথ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করে তবেই তবেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অথচ দেশে চালু ফরেনার্স অ্যাক্টে অনুপ্রবেশের দায়ে অভিযুক্তদের তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে তারা ভারতের বৈধ নাগরিক। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই ফরেনার্স অ্যাক্টেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ফরেনার্স ট্রাইবুন্যাল ফর অসম অর্ডার নামে একটি বিশেষ আইন চালু করে। কিন্তু লাভ হয় না। সুপ্রিম কোর্ট ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর এই বিশেষ আইনটিকে সংবিধান বিরোধী বলে খারিজ করে দিয়ে পুনরায় বলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠাতে বলে। বলা হয় যে ২০০৫ সালের ১২ জুলাই তারিখ দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে মনমোহন সিংহ সরকার এবার ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়। অসমের কংগ্রেস সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দ্রুত রেশন কার্ড ও ভোটদাতাদের পরিচয় পত্র দেওয়া শুরু হয়। সেই কাজটি ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে এখন পুরোদমে চলছে। মুসলিম তোষণে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা কেউ কারো থেকে কম নয়।

তবে অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধানের পথটা কি? কারণ, ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং মিডিয়া অনুপ্রবেশ নিয়ে একটি কথাও বলে না। তাই এখন সময় এসেছে ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত মানুষ ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মাত্র চারটি দাবি জানাতে হবে।

১) সুপ্রিম কোর্টের ২০০৫ সালের ১২ জুলাই এবং পরবর্তীকালে ২০০৬-এর ৫ ডিসেম্বর তারিখের নির্দেশ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে মানতে হবে।

(২) পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ আপাতত ছিন্ন করতে হবে। কারণ, রেল ও সড়ক পথে বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করার পর ৯০ শতাংশই ফিরে যায় না।

(৩) পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ধ্বংস করতে সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। কারণ, বিগত এক দশক ধরে বহু আবেদন সত্ত্বেও পাক ও বাংলাদেশ সরকার এই শিবিরগুলি বন্ধের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

(৪) ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে। কারণ, এর ফলে এই দুই শত্রু রাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদীরা সহজেই ভারতে প্রবেশ করে নাশকতা চালাবে। মনে রাখতে হবে ভারতের ইসলামিকরণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

গরু পাচার

- **দিনে প্রায় ২০ হাজার গরু ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে প্রতিনিয়ত।**
- **বাংলাদেশ ১.৮৭ কোটি টন গো-মাংস বিদেশে রপ্তানি করে বাৎসরিক ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করছে।**

মুসলিম মিল্লীর সঙ্গে মিলে দিল্লী দখলের ছক

শিবাজী গুপ্ত

কলকাতায় স্বস্তিকা, বিশ্ব হিন্দু বার্তা এবং নতুন দিল্লীতে অর্গানাইজার, পাঞ্চ জন্য প্রভৃতি পত্রিকাগুলি দীর্ঘকাল ধরে যে অশুভ সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ জাতীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছিল, অবশেষে তাই ঘটতে চলেছে। ভারতের মুসলমানরা 'অসাম্প্রদায়িক' রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলেছে। এতদিন ইসলামজাদা সেকুলার দলগুলি মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশায় কেঁদে ভাসাচ্ছিল। এখন মুসলমানদের কান্না তারা নিজেরাই কাঁদবে। কাঁদিয়ে নয়, হুমকি দিয়ে তারা তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে নেবে। দিতে দেরি হলেই দাঙ্গা বাধাবে — যেমন অতীতে দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তান হাসিল করে নিয়েছে।

সেই মুসলমানরা হবে অসাম্প্রদায়িক? যাদের অস্থি-মজ্জায় থরে থরে সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত রয়েছে তারা হবে অসাম্প্রদায়িক? একথাও ভারতবাসীকে বিশ্বাস করতে হবে? তবে কালে কালে কত অঘটনই তো ঘটে। তাই না গ্রাম্য কবিয়াল অকপট ভাষায় সেই অঘটন ঘটন পটিয়সীর ক্ষমতা বর্ণনা করে গেয়েছেন :—

কালে কালে কি না ঘটে,
গঙ্গাস্নান পাতকুয়ার ঘাটে,
ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে,
ছাগে চাটে বাঘের গাল।।

আমরা বারবার বলেছিলাম মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-কে মাথায় তুলে নেচ না, তাঁকে দুধ-কলা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলো না-ওটা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে, সময় হলেই ছোবল মারতে ছাড়বে না। খনার বাক্য তো মিথ্যা হবার নয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এই নির্ভুল প্রবচনে উপনীত হয়েছে—

চোরের পোনা, সাপের ছানা,
আগুনের কণা
এই তিন জাতেরে বিশ্বাস করো না।

সুতরাং মুসলিম জনসংখ্যা এককভাবে লোকসভায় শতখানেকের মতো আসন দখল করার অবস্থায় আসতেই মুসলমান নেতারা আলাদা দল গঠন করে, মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আর লালু-মুলা, মায়া-মমতা, কারাট- ইয়েচুরি ও রামবিলাসের সমর্থনের

তোয়াক্কা না করে, নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছে। তাই নিজেরাই আসন ঠিকঠাক করে অন্তত ৮০টি আসনে স্বশক্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খবরে প্রকাশ দিল্লীর বাটলা হাউসে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে পুলিশের গুলিতে নিহত দুই যুবকের মৃত্যুর প্রতিবাদের উদ্দেশে গড়ে ওঠা মুসলিম জোট এখন দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে একটি তৃতীয় বিকল্প গড়তে চাইছে। জামাত-এ-ইসলামী-এ-হিন্দের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ভারতীয় মুসলিম কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে থাকা পাঁচটি দল কংগ্রেস ও বিজেপি'র বিকল্প হিসেবে আলাদা একটি রাজনৈতিক দল গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জামাতের নেতৃত্বে গড়া কমিটিতে আছে পাঁচটি মুসলিম সংগঠন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী হল জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দ, মজলিসে মুশাওয়ারাত এবং সর্বভারতীয় মিল্লী কাউন্সিল।

এই কমিটি এ দেশে ৮০টির মতো লোকসভা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করেছে যেগুলিতে জয়-পরাজয়ে মুসলিম ভোটের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

কোনও কোনও মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে এ সব সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে কমিউনিস্টদের সতীত্ব হানি হবে না? এ আবার কি রকম কথা। পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে যারা দেহ ব্যবসা চালায় তাঁদের আবার সতীত্বের গৌরব সাজে না কি? কমিউনিস্টরা কার সঙ্গে না ঘর করেছে? ইংরেজ, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, এমনকী বিজেপি — কেউ বাদ যায়নি। সুতরাং এখন জামাত বা মিল্লির সঙ্গে ঘর করতেও তাঁদের রুচিতে বাধবে না। সুক্তোর সঙ্গে গোস্তের সুরুয়া মেশাতে তারা চিরদিনই ওস্তাদ।

আর তো হবেই না বা কেন? কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট — এই তিনটি দলই বৃটিশের পয়দা। বৃটিশের যেমন ভারত বিভাজনে কোনও বেদনা ছিল না — এদেরও কোনও ব্যথা বেদনা ছিল না। যারা যে গরুর দুধ পান করে, প্রাণে বাঁচে সেই গরুকেই জবাই করে গোস্ত খায়, তাদের সঙ্গে যারা জোট বাঁধে, বিজেপিকে ঠেকাতে ও হটাতে ঘোঁট পাকায়, তাদের কাছে মাতৃভূমি তো গো-মাতা নয়, গোস্ত খাবার পশু বিশেষ। তাই গো-হত্যায় যেমন এদের চিত্ত-বৈকল্য ঘটে না, তেমনি

সারণী

	১৯৫১		১৯৬১		১৯৭১		১৯৮১		১৯৯১		২০০১	
	হিন্দু	মুসল	হিন্দু	মুসল	হিন্দু	মুসল	হিন্দু	মুসল	হিন্দু	মুসল	হিন্দু	মুসল
পশ্চিমবঙ্গ (শতাংশ)	৭৯.৮০	১৯.৪৬	৭৯.৪২	২০.০০	৭৮.৯৮	২০.৪০	৭৭.৯	২১.৫১	৭৫.৮২	২৩.৬১	৭২.০	২৫.২০
বিহার (শতাংশ)	৮৭.৬৫	১১.২৮	৮৬.৪৬	১২.৪৫	৮৪.৩৬	১৩.৪৮	৮৪.৮২	১৪.১২	৮৪.২২	১৪.৮১	৮৩.২	১৬.৪০
অসম (শতাংশ)	৭৩.৩২	২৪.৬৮	৭২.২৭	২০.৩০	৭২.৮৩	২৪.৫৬	৭০.২০	২৬.৪	৬৮.২০	২৮.৪০	৬৪.৯	৩০.৮১

এবং এই অস্ত্রকে হাতিয়ার করে জামাত সেকুলার হারামজাদা দলগুলির সঙ্গে মোলাকাত ও খানাপিনা শুরু করেছে। তাদের জালে প্রথমেই ধরা দিয়েছে জনতা (সেকু) দলের দেবগৌড়া। তবে তারও আগে মুসলমানদের আচকানের কোণা চেপে ধরেছে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শকুনি এবং বিভীষণের মিক্‌চার সিপিআই দল। জামাতের নেতারা জানিয়েছে ইসলামি-বামপন্থী জোটে সামিল হবার সম্ভাবনায় সম্প্রতি জামাতের নেতাদের সঙ্গে সিপিআই নেতা এ বি বর্ধনও বৈঠক করেছেন। কৌশল পার্টি যখন বঁড়শি গিলেছে তখন প্রকৌশল পার্টি কি পিছিয়ে থাকতে পারে? বিষবৃক্ষের কলমেও বিষফল ফলে। সিপিএমও জামাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য দড়ি পাকাতে শুরু করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ অতীতে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শরিকদার সিপিআই ও আত্মজ সিপিএম মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারার পৃষ্ঠ ও পুষ্ট বিভিন্ন তকমাধারী মুসলমান দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার ভারতকে ছিন্ন-ভিন্ন করার মতলবে উঠে পড়ে লেগেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সোসালিস্ট পার্টিগুলির শাখা-প্রশাখা দলগুলি, লালু, মুলায়ম, রামবিলাস, মায়াবতী ও মমতা এ্যাণ্ডকোং- দলগুলি। এদের কাছে মুসলিম ভোটের এবং নির্বাচনী তহবিলে মুসলিম লবির আদর-কদর অপ্রতিরোধ্য। কারণ ব্যয়বহুল নির্বাচন জিততে হলে, অবাধে ভোটের সঙ্গে অবৈধ টাকারও প্রচণ্ড সরবরাহ চাই। সেটা একমাত্র মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক নোটই দিতে পারে।

মাতৃহত্যায়ও তারা বিচলিত বোধ করে না। দেশ তো মাটি বিশেষ, ওর ভাগাভাগিতে ব্যথা লাগার কি আছে?

আর সে কারণেই, যে বিজেপি'র কাছে দেশ শুধু একটা ভূমিখণ্ড নয়, মাতৃসদৃশ, মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি, ধর্মভূমি, দেবভূমি এবং কর্মভূমি, তা পুনরায় গো-খেকোদের শাসনে যাবার আশঙ্কায় আতঙ্কিত। তাদের হাতে যাওয়াই আবার ভারত বিভাজন। আর বিজেপিকে ঠেকাতেই এদের এতো শলা পরামর্শ। অবস্থা তেমন হলে কংগ্রেসও এদের সঙ্গে যোগ দেবে। কারণ, ভারতমাতার কণ্ঠনালী ছেদনে কংগ্রেসের তো পাকা হাত। সেই পুরনো ক্ষতে ছোরা চালাতে বিদেশিনী সোনিয়ার হাত একটুও কাঁপবে না — রাহুল গান্ধী দিল্লীর মসনদে বসতে পারলেই, ধমনীতে মুসলিম রক্ত প্রবাহিত নেহরু ডাইনেস্টির শাসন অব্যাহত থাকবে।

সেই উদ্দেশ্য সাধনেই ইসলামী মিল্লির সঙ্গে জোট বেঁধে দিল্লী দখলের পরিকল্পনা। এঁদের কাছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক; আর কট্টর মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, পরধর্ম বিদ্বেষী, সন্ত্রাসী ও জেহাদী দলগুলি অসাম্প্রদায়িক। যাদের জন্মের ঠিক নেই, জন্মদাতার পরিচয় সন্দেহজনক সে সেকুলারদের রক্তের ডি এন এ টেস্ট করলেই জন্মদাতার পরিচয় মিলবে! ●

অসমে নিরাপত্তার অবস্থা ভয়াবহ

লেঃ জেঃ এস কে সিন্‌হা (অবঃ)

'ভারতবর্ষ সরকারি পরিচালনার দুর্বলতার জন্য এক গোবেচারা, নরম প্রকৃতির রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। গুয়াহাটি, কোকরাঝাড়, বনগাঁইগাঁও ও বরপেটাতেধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর দিল্লীতে এক আলোচনা সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস কে সিন্‌হা। আলোচনার বিষয়ই ছিল — 'ডেঞ্জারাস সিকিউরিটি সিচুয়েশন ইন্ অসম'। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা ও দুর্বলতার কারণেই অসমে ৮১ জন নিরপরাধ মানুষের জীবন অকালে চলে গেল। সরকারি অযোগ্যতার ফলেই, সন্ত্রাসবাদীরা একের পর এক শহরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে।

লেঃ জেঃ এস কে সিন্‌হা

শ্রীসিন্‌হা আরও বলেন, অসমের ক্ষেত্রে, নিজেদের তৈরি করা ক্ষতই ভোগাচ্ছে। অনেক পিছনে ষাটের দশকে অসমের তৎকালীন রাজ্যপাল বি কে নেহরু এবং মুখ্যমন্ত্রী বি পি চালিহা কেন্দ্রকে লিখিতভাবে অসমে বন্যার স্রোতের মতো, আগত বিদেশী অনুপ্রবেশকারী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। তখন কেন্দ্র তাঁদেরকে 'স্টপ দি ননসেন্স' বলে দাবিয়ে দিয়েছিল। "বি কে নেহরু ছিলেন রাজবংশজাত। ইন্দিরা গান্ধীর পিসতুতো ভাই। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'Nice Guys Finish Second' বইতে লিখেছেন। শ্রীচালিহা ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম প্রজন্মের নেতাদের সমগোত্রীয়। তাঁদের আবেদনের বা সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তখন থেকেই অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়াটা ছিল নির্ভেজাল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিন্ন অঙ্গ। আলোচনাসভায় এমনই মন্তব্য করেছেন শ্রীসিন্‌হা। 'সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের একাংশ আমাকে উদ্ধৃত করায় আমিও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি'-বলে শ্রীসিন্‌হা জানিয়েছেন। অসমে বাংলাদেশী অভিবাসন বাড়ার ফলে যে জনসংখ্যাগত আক্রমণ তাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সম্পূর্ণ একশভাগ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এর কারণই হল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল হিতেশ্বর

শইকিয়া অসম বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকারি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, অসমে তিন লক্ষ অবৈধ অভিবাসী রয়েছে। দুদিন বাদেই চাপ দিয়ে সেই শইকিয়াকে দিয়েই আবার বিবৃতি দেওয়ানো হয় — অসমে একজনও অবৈধ অভিবাসী নেই। সরকারি স্তরে এই

“অসমে বাংলাদেশী অভিবাসন বাড়ার ফলে যে জনসংখ্যাগত আক্রমণ তাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সম্পূর্ণ একশভাগ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এর কারণই হল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি।”

টালবাহানার ব্যাপারটা আলোচনাসভায় জেনারেল (অবঃ) সিন্‌হা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেন।

এরপরেও, ১৯৯৭ সালের ৬ মে, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সংসদে জানিয়েছিলেন যে, এক কোটি বাংলাদেশী ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। সাম্প্রতিককালে ২০০৪ সালের ১৫ জুলাই কেন্দ্রীয়, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, এক কোটি কুড়ি লক্ষ অবৈধ অভিবাসী ভারতে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। ঠিক তারপরদিনই প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং গুয়াহাটিতে যান (প্রসঙ্গত, মনমোহন সিং অসম থেকেই রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন)। একথা বুঝতে কোনও অসুবিধা হওয়ার নয় যে তিনিও স্থানীয় কংগ্রেসী মাতববরদের চাপে পড়ে বিবৃতি দেন — স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তার কোনও নিশ্চিত প্রামাণ্য ভিত্তি নেই। মজার ব্যাপার হল ওই জয়সওয়ালই এক সপ্তাহ পরে আর এক বিবৃতিতে বলেন, সেদিন সংসদে তিনি কথার কথাই বলেছিলেন। শ্রীসিন্‌হা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, অসমে জেহাদ সন্ত্রাস-এর মূলে রয়েছে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসন। কেবলমাত্র ভোটের জন্য ক্ষমতাসীন দল এই সমস্যার বিষয়ে শুধু চোখ বুজে আছে নয় — বাংলাদেশী অভিবাসীদের উৎসাহিতও করে চলেছে।

“বাংলাদেশ থেকে অসমে অনুপ্রবেশ অবিচ্ছিন্নভাবে অবাধগতিতে চলছে। অসমের বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জেলা এবং নিম্ন অসমের জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ-এর ফলে জনবসতির ভারসাম্য ও চরিত্রই বদলে গিয়েছে। বাংলাদেশীরাই সেইসব জেলাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধুবড়ি জেলার লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বহুচর্চিত ‘চিকেন নেক’। ধুবড়ি জেলাতে বাংলাদেশী মুসলমানদের সংখ্যা ৭০ শতাংশের বেশি। এর ফলে সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থা শুধু অসমীয়াদেরকেই প্রভাবিত করেনি, সারা রাষ্ট্রকেই প্রভাবিত করেছে। দেশব্যাপী জেহাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে দ্রুত জবরদস্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এই অবিরাম গতিতে চলা বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে।” এভাবেই অসম-বিষয়ে অভিজ্ঞ জেনারেল এস কে সিন্‌হা বক্তব্য উপস্থাপিত করেন।

মুদ্রা পাচার

●দুষ্কৃতীদের হাত ধরে ১, ২ ও ৫ টাকার ভারতীয় কয়েনগুলি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এগুলি বাংলাদেশে দাড়ি কামানোর ব্লেড, বন্দুকের গুলি তৈরি, পেনের নিব তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে ফয়দা লুটছে।

অনুপ্রবেশের থাবায় জাতীয় নিরাপত্তা সঙ্কটে

বাসুদেব পাল

ভারতবর্ষের মোট ২৮টি প্রদেশের ২১টিতেই থিক থিক করছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। যাদের বেশিরভাগই ধর্মে মুসলমান। অথচ কোনও রাজনৈতিক দল সব জেনে বুঝেও মুখ ফুটে বলছে না যে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা অনবরত ভারতে অনুপ্রবেশ করে চলেছে। ব্যতিক্রম শুধু বিজেপি। অন্যদিকে প্রচুর তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনওদিনই স্বীকার করেনি যে তাদের দেশ থেকে দলে দলে মুসলমানরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভারতে ঢুকছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। হিন্দুরা ভারতে আসছে একরকম বাধ্য হয়ে — নিজেদের মেয়ে, বউদের মর্যাদা বাঁচাতে, ধর্ম রাখতে। ভারতবর্ষের হিন্দুরা হিন্দুদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করুক বা না করুক মুসলমানরা কিন্তু তাদের ভাই-বেরাদরদের সবরকম সাহায্য করেছে, করে চলেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন বছরে যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তা দেখলেই ঝুলি থেকে বেড়াল বের হয়ে পড়বে। ১৯৯৫ সালে ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় ভোটারদের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭৮ জন। এখানে উল্লেখ্য, যে কোনও দেশেই প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারই আইনগতভাবে স্বীকৃত। অথচ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ভোটারের সংখ্যা আরও ৬১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৬৭ জন বেশি ছিল। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ-এর নির্বাচন ঘোষণা করে যে কুড়ি লক্ষ (২০,০০,০০০) ভোটারকে দেশে দীর্ঘদিন না থাকার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে। এটাই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের স্বপক্ষে একটা জোরালো প্রমাণ। এই সব বিদেশী বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরা সারা ভারত জুড়ে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বড় বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা আর ছোট-খাটো চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-এ সীমাবদ্ধ নেই। তারা একদিকে বিশেষ মুসলিম

প্রেমী ছদ্ম-সেকুলার এবং মুসলমানদের সর্বাত্মক প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট, অন্যদিকে মুসলিম লীগ অথবা অসমের এ ইউ ডি এফ-এর মতো দলের বিশ্বস্ত ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। যার ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা ক্রমশ দিন দিন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল হয় মুসলিম থোক ভোটের লোভে অথবা কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বলে বদনাম করে সেজন্য দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ছেলেখেলা করে চলেছে। হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের টীকা-টিপ্পনী, আদেশ-নির্দেশকে

ধৃত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা।

অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ৬ মে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) নিজেই সংসদে বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, এক কোটির বেশি বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভারতকে তাদের নিজ ঘরে পরিণত করে বসবাস করছে। তারও দু'বছর আগে ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণ 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন, "অসমের নির্বাচক তালিকায় দশ লক্ষের বেশি বাংলাদেশীর নাম রয়েছে।" আমেরিকান একাডেমি অফ্ আর্ট এ্যাণ্ড সায়েন্স এবং টরেন্টা ইউনিভার্সিটি এক সমীক্ষা করে জানিয়েছিলেন যে অসমের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই বাংলাদেশী অভিবাসী (অনুপ্রবেশকারী)। এই একই সমীক্ষক দল (Research Team) জানিয়েছিল যে, ভারতে কুড়ি মিলিয়ন অর্থাৎ দু'কোটি বাংলাদেশী রয়েছে যাদের মধ্যে কুড়ি লক্ষ বাংলাদেশী কেবলমাত্র ১৯৭১ সালেই ভারতে ঢুকেছে।

আবারও ১৯৯৬ সালের ২৮ মে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল, 'বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বলছে তাদের বারো লক্ষ ভোটার দেশেই দীর্ঘদিন নেই। তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দিলে কঠোর রাজনৈতিক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে।' তারা যে আসলে ভারতে ঢুকে পড়েছে, সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারপরেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations Organisation) এক সমীক্ষায় জানিয়েছিল যে, ১৯৯১ -তে বাংলাদেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ১১ কোটি ৮০ লক্ষ হলেও সেদেশের সেন্সাস রিপোর্টে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছে। তাহলে এককোটি বাংলাদেশী কোথায় গেল? দ্বিতীয়ত, ১৯৫১ সালে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু (হিন্দু) জনসংখ্যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। তা বাড়ার বদলে কমতে কমতে ১৯৯৫-এ দশ শতাংশে পৌঁছে গেছে। তাহলে মানুষগুলো কোথায় গেল? সোজা হিসাব হল, হয় তাদেরকে গোপনে মেরে ফেলা হয়েছে অথবা তারা ভারতে ঢুকে পড়েছে। হিন্দুদের বেশির ভাগই মান-ইজ্জত বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে এসেছে। বাকিদের একাংশকে তো মেরে ফেলা হয়েছে অথবা জোর-জবরদস্তি মুসলমান করে নেওয়া হয়েছে — এটাই বাস্তব। এছাড়াও পাঁচ লক্ষ বিহারী (উর্দুভাষী) মুসলমান বাংলাদেশে বসবাস করত, তাদের একজনকেও গত ১৯৯১ থেকে বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছেনা। তারা একসময় ভারতের ভেতর দিয়ে (লং-মার্চ) পাকিস্তানে যাবে বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তারা পাকিস্তানেও যায়নি আর সমুদ্রেও ডুবে মরেনি — ভারতে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছে। নববুই-এর দশকে কলকাতায় ধর্মতলায় তারাই এক মিছিল ও সমাবেশ করে ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করেছিল। তবে হাজার হাজার হিন্দুকে যে স্রেফ মেরে ফেলা হয়েছে এটা ঘটনা, ১৯৯২ সালে এরকম ঘটনা ঘটেছে। ভারত বার বার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের কথা বললেও বাংলাদেশ একবারও স্বীকারই করেনি। বিদেশ মন্ত্রকের হিসেবে ভারতে বাংলাদেশীদের সংখ্যাটা সত্তর লক্ষ। এই সংখ্যাটা সময়ে সময়ে অদল-বদল হয়। ভারতের প্রাক্তন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জে এন দীক্ষিত বলেছেন, "আমাদের কাছে (ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যুরো) সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে যে সত্তর থেকে নববই লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে শুধু অনুপ্রবেশ করেছে তাই নয়, নিজেদেরকে ভারতীয় হিসেবে পঞ্জীকরণও করে নিয়েছে।"

"কম করেও ১৫ থেকে কুড়ি লক্ষ বাংলাদেশী ১৯৭১-১৯৯৯ সালের মধ্যে ভারতে ঢুকেছে। আর ফি বছর অন্ততঃপক্ষে তিন লক্ষ বাংলাদেশী বাংলাদেশ থেকে ভারতসীমান্ত পার করে সন্নিহিত অসম, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে ঢুকে স্থায়ী হয়ে বসবাস করছে।" এই মন্তব্য করেছেন ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব জি কে পিল্লাই, ১৯৯৯ সালের ১৮ আগস্ট তারিখে।

ভারতীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০০১ সালে তৈরি এক হিসেবে বলা হয়েছিল, "১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেড় কোটি থেকে এক কোটি সত্তর লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করেছে।

২০০৪ সালের ১৪ জুলাই সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের বর্তমান রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, সারা দেশে এককোটি কুড়ি লক্ষ তিপান্ন হাজার নয়শ পঞ্চাশ জন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, যার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ শুধুমাত্র অসমে এবং এটা ৩১ ডিসেম্বর ২০০১-এর হিসেব। তবে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক সাতান্ন লক্ষ বাংলাদেশী রয়েছে। এসব তথ্যের সূত্র হল আই বি রিপোর্ট (সারণী দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের (মুসলিম) এই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অলঙঘনীয় ব্যাপার ঘটেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। বিশেষত অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত জেলাগুলোতে। আর তা হল বাংলাদেশী মুসলিম জনপ্লাবনের জেরে সীমান্ত জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার বান ডেকেছে। একই অবস্থা পূর্ব বিহারের কয়েকটি জেলারও। বিহারের ওই জেলাগুলোতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি। কোথাও কোথাও তিন গুণ। এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে কোনওভাবেই

কড়া প্রহরায় চলছে সীমান্তে বেড়া মেরামতির কাজ।

স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা যায় না।

এই ক্রমাগত বন্যার তোড়ের মতো বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ও সেই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটলিপ্সু রাজনৈতিক দলের সৌজন্যে এবং স্থানীয় মুসলমানদের যোগাযোগে এক ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এর পরিণামে আজকের ভারতবর্ষে ২০/২৫টি লোকসভার আসন এবং অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লীর ১২০-১২৫টি বিধানসভাক্ষেত্রের নির্বাচনী ফলাফলের চাবিকাঠি ওই বাংলাদেশী মুসলমানদের হাতে চলে গিয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দশবছরের মধ্যে কমপক্ষে ৫০টি লোকসভা এবং ২৫০ বিধানসভা কেন্দ্রের জয়-পরাজয় ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই ঠিক করে দেবে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার, সংখ্যাবৃদ্ধির আধিক্য এবং একাধিক বিষয়ের সামাজিক ও ধার্মিক বৈধতার কথাটা খেয়াল রাখলে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করা সহজ হবে।

বাংলাদেশী মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবটা অসমে ভৌগোলিক দিক থেকেও বৃদ্ধির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। এই বর্ণিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে অসমের মতো বড় রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা বেশ সমৃদ্ধ হয়েছেন। অসমের ২৭টি জেলার মধ্যে ৭টি জেলা, যথাক্রমে — বরপেটা, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, মরিগাঁও, নওগাঁ, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলায় মুসলমান কর্তৃত্ব বা আধিপত্য আর কোনও রাখ-ঢাক করার অবস্থায় নেই। এক অনুমান অনুসারে অসম বিধানসভার ১২৬টি আসনের মধ্যে ৫৪টি আসন বাংলাদেশী মুসলমান ভোটারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে ২০১০-২০১৫ সালের মধ্যেই। সেদিন আর দূরে নেই যেদিন ওই বাংলাদেশী মুসলমানরা রাজ্যের স্থিতাবস্থার পক্ষে শুধু বিপজ্জনকই নয়, এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রই পাল্টে দেবে। আর তাদের মধ্য থেকেই তারা নিজেদের লোককে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে বসাবে। একথার প্রামাণিকতা গত ২৩ জুলাই ২০০৮ গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়েই দেখা গেছে। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশীরাই অসমের আসল 'কিং-মেকার'। এই রায়ের প্রেক্ষিতে অল অসম ছাত্র ইউনিয়ন (আসু) ভারত-বাংলাদেশ খোলা সীমান্তকে নিরবচ্ছিন্ন বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের জন্যই দায়ী করেছে। তাদের কথায়, ওই খোলা সীমানা ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে ঢোকার উন্মুক্ত নিরাপদ প্যাসেজ।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী মুসলিম জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, আগামী ৫ থেকে দশ বছরের মধ্যে তারাই রাজ্যের মুখ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। ফলে রাজ্যের মূল অধিবাসীরা তাদের স্বকীয়তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভাক্ষেত্রের ৫২টিতে বাংলাদেশী মুসলিম ভোটাররাই নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। আরও অন্য ১০০টি আসনে তারাই ফলাফল নির্দ্ধারণে চূড়ান্ত (Crucial) ভূমিকা নিতে পারে।

এখন স্বভাবত প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অবস্থা হওয়ার কারণ কি? একদিনে নিশ্চয়ই হয়নি। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হারে অভিবাসন হয়। কিন্তু ভারত সরকার তার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন এজেন্সির মতে বাংলাদেশ রাইফেলস্ (বি ডি আর) প্রত্যক্ষভাবে তাদের দেশের মুসলমান পরিবারদের দারিদ্র্যের কারণে ভারতে ঠেলে-ঠুলে পাঠিয়ে দেয়। এটা খালেদা জিয়ার রাজত্বকালে পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে। তখন মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান বি ডি আর-এর ডিরেক্টর ছিলেন। আর একটা বড় কারণ এদেশে বাংলাদেশীদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তার ফলে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করাটা সহজ হয়েছে। এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশ মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়ার সামঞ্জস্য একাট বড় প্লাস পয়েন্ট। একটা সময় পর্যন্ত দু'দেশেরই সীমান্তে বসবাসকারী মুসলমানদের অবাধে বিয়ে-সাদী নিকাহ্ চলত। এখন বি এস এফ-এর কড়াকড়িতে কিছুটা কমেছে। উপরোক্ত কারণ ছাড়াও কিছু গভীর দুরভিসন্ধি আছে। কিছু কারণ রাজনৈতিক, আর্থিক, ধার্মিক এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মকও।

ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বেশিরভাগ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী গরীব মুসলমান। তারা ভারতে বাংলাদেশ সন্নিহিত জেলায় ঢুকে প্রথমে অস্থায়ী তারপরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অসমের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, মরিগাঁও, নওগাঁ, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাড়, শোণিতপুর এবং জোড়হাট; এবং পশ্চিমবঙ্গে — কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলাতে রোজগারের ধান্ধায় ঢুকে বসে পড়েছে। এই বিষয়ে সেন্টার ফর রিসার্চ ইন্ ইন্দো-

বাংলাদেশ রিলেশনস্-এর বক্তব্য — অন্ততপক্ষে দুটো রাজ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের (মুসলমান কর্তৃত্ব বা আধিপত্য) গড়ে উঠেছে। অসমে নদীর মধ্যে যে চড়া বা ডাঙ্গা দ্বীপের মতো এলাকা জেগে উঠেছে সেখানে তীরভূমিকে স্থানীয়ভাবে 'চর' বলা হয়। ওই এলাকা ব্যাপকহারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিরাচরিত বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিনামূল্যে। এছাড়া নদীর ভাঙ্গা-গড়া বা দিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার স্থলভাগের সরকারি রেভিনিউ গ্রাম তালিকাতেও নথিভুক্ত হয় না। মজার ব্যাপার হল কোনও বিশেষ কারণে সরকারের পক্ষ থেকেও ওই সকল এলাকা পঞ্জিকৃত করার কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। ব্রহ্মপুত্র নদীর এরকম চরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে ২২ লক্ষ নববই হাজারের মতো লোকই মুসলমান, দেড় লক্ষ 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু', ৫০ হাজার কলিতা-নেপালী, ৫০ হাজার মিশি আহোম্, এবং ৫ হাজার হল কোচ-রাজবংশী। এভাবে দেখা যাচ্ছে চরের বাসিন্দাদের বেশির ভাগই মুসলমান যারা অনুপ্রবেশ করে বসে পড়েছে। এমনকী সরকারি রিপোর্টেও বলা হয়েছে — অভিবাসী মুসলমানরা ওই চরভূমিতে বিশালসংখ্যায় বর্তমান।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অবৈধ বাংলাদেশীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে নির্দ্বিধায় বিনাবাধায় সরকারি সার্ভে বিহীন, পুলিশী নজরদারিবিহীন হিসাব বহির্ভূত চর এলাকা দখল করে বসে পড়ছে। এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে বি এস এফ এবং ভারতের ইন্টারন্যাশন্যাল বর্ডার রিভার পুলিশ ফোর্স নজরদারি করতে কয়েকটি আউট-পোস্ট চর এলাকায় বসিয়েছে। তবে তা যথেষ্ট দেরিতে এবং ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল বয়ে চলে গেছে।

এর ফলে ওই এলাকায় বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এখন এক ভিন্ন পদ্ধতিতে হচ্ছে — দালালের মাধ্যমে। দালালরাই অনুপ্রবেশকারীদের বর্ডার পার করিয়ে এনে চরের মুসলমান জমিদারদের হাতে সঁপে দেয়। ওই জমিদারদের স্থানীয়ভাবে দেওয়ান অথবা মাতব্বর বলা হয়। দালাল মাথাপিছু পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা পায়। তথাকথিত জমিদাররা তাদের নিরাপত্তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নেয়। পরিবর্তে ওই বাংলাদেশিরা নির্বাচনে ভোট দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখায় বা ঋণ শোধ করে।

যে কোনও কারণেই বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকুক না কেন তাদের উপস্থিতি পূর্বাঞ্চলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জনবসতির ধর্মীয় ভারসাম্য, আর্থ-সামাজিক সামঞ্জস্যকে বদলে দিচ্ছে। অসমের চরভূমিতে বাংলাদেশীদের শুধুমাত্র জনবসতি নয়, তারা সরকারি জমি দখল, কৃষি জমি দখল, বেআইনি বসতি, সংরক্ষিত বনাঞ্চল কেটেও বসতিস্থাপন করছে। তারা প্রকৃত ভারতীয়দের রুটি-রুজিতে থাবা বসাচ্ছে, যার ফলে বেকারত্ব-বেরোজগারদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশী মুসলিমরা ভারতে ঢুকে কম পারিশ্রমিকে কাজ করে।

ঘাঁটি গেড়ে বসেই বাংলাদেশীরা যেন তেন প্রকারেণ রেশন কার্ড বা ভোটার তালিকায় নাম তুলে। বহাল তবিয়তে ভারতে থাকার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলে। ফলে ওই বাংলাদেশীরাই অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে বিরাট বড় ভোটব্যাঙ্ক। যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে চোখ বুজে থাকে তাহলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর। দ্রুত যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ওই বাংলাদেশীদের চিহ্নিতকরণ, নির্বাচকতালিকা থেকে ছাঁটাই এবং সর্বোপরি রামধাক্কা দিয়ে দেশের সীমানা পার না করলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন। যার লক্ষ্মণ অসম ও ত্রিপুরার বিস্ফোরণ-এ দেখা গেছে।

সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো মসজিদ মাদ্রাসা

- **ভারত সীমান্তে মসজিদ - ৯০৫টি**
- **ভারত সীমান্তে মাদ্রাসা - ৪৩৯টি**
- **বাংলাদেশ সীমান্তে মসজিদ - ৯৬০টি**
- **বাংলাদেশ সীমান্তে মাদ্রাসা - ৪৬৯**

এছাড়াও দু'দেশের মাঝে জিরো পয়েন্টে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ মাদ্রাসা ও মসজিদ।

ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের সংখ্যা (আনুমানিক)

ক্রমাঙ্ক	রাজ্যের নাম	জেলা / এলাকা	অবৈধ বাংলাদেশীদের সংখ্যা
১	অসম	ধুবড়ি, বরপেটা, কামরূপ, নওগাঁ, করিমগঞ্জ, মরিগাঁও, বনগাঁইগাঁও, কোকরাঝাড়, দরং	৬৭,০০,৩০০
২	অরুণাচল প্রদেশ	পাপুম্‌পারে	১,০৮০
৩	মিজোরাম		৩৯
৪	বিহার	ভাগলপুর, সমাস্তপুর, কাটিহার, সাহেবগঞ্জ কিশানগঞ্জ, আরারিয়া, পাকুড়, পূর্ণিয়া ও গয়া	৬,৪১,৩৯৬
৫	নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা, ডিমাপুর, তেনসাঙ্, মন, মকোকচং, বোকা , জুনেবতো, ফেক	৭৯,৮০০
৬	মেঘালয়	ফুলবাড়ি, মহেন্দ্রগঞ্জ, পশ্চিম গারো হিলস্	৪০,৫১৮
৭	ত্রিপুরা	পশ্চিম ত্রিপুরা, নর্থ ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪,৪৪,৮৬৭
৮	পশ্চিমবঙ্গ	কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া , নদীয়া এবং কলকাতা	৭৬,৮০,১২২
৯	ওড়িশা	কেন্দ্রপাড়া, ভদ্রক, জগৎসিংপুর, বালেশ্বর, খুড়দা, গঞ্জাম, রায়গড়, ময়ূরভঞ্জ, সম্বলপুর	৪১,৬৭০
১০	আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ	আন্দামান	৪,০৫০
১১	দিল্লী	সলিমপুর, সীমাপুরী, যমুনাপুস্তা, গান্ধীনগর, শহীদনগর, কৃষ্ণনগর, তুলসী নিকেতন, গীতা কলোনী, কুরেজি, শশিগার্ডেন, দিলশাদ গার্ডেন, ভজ্জপুরা। এছাড়া দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশের লাগোয়া এলাকা।	৫,০২,৩৬৬
১২	মধ্যপ্রদেশ	দেবাস, সরগুজা, মন্দসর, সিধি, খরবা	৯৫০
১৩	মহারাষ্ট্র	থানে, মুম্বাই, পুনা, গড়চিরুলি, গণ্ডিয়া	২৮,০৮৯
১৪	পাঞ্জাব	মালেকোটলা, পাতিয়ালা, মোহালি, চণ্ডীগড়	৩৪৫
১৫	হরিয়ানা	পাণিপথ, ফতেহাবাদ, গুরগাঁও, রোহ্‌টক, ফরিদাবাদ	৮০০
১৬	রাজস্থান	নাগৌর, বাড়মের, জয়শলমীর, আজমীর, বিকানীর, জয়পুর, আলোয়ার, বারণ, রাজসমুন্দ	৪,৪৭,১৫০
১৭	গুজরাট	জামনগর, কচ্ছ, বনসকন্ঠ, পোরবন্দর	১৫০
১৮	কর্ণাটক		১৫
১৯	হিমাচল প্রদেশ		২৫
২০	জম্মু ও কাশ্মীর		৪৮০
২১	উত্তপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড	এলাহাবাদ, মীরজাপুর, দেওরিয়া, জৌনপুর, ফৈজাবাদ, গাজীপুর, আজমগড়, গোরখপুর, চান্দৌল, মীরাট, বারাণসী, গাজিয়াবাদ, কানপুর, হামিরপুর, লক্ষ্মৌ, মহারাজগঞ্জ, সাহারানপুর বিজনৌর, বরেলি, বাহরাইচ, মোরাদাবাদ, জি বি নগর, রায়বেরিলি, হরিদ্বার, দেরাদুন, সন্ত রবিদাস নগর।	৩৪,৮৭৪

সূত্র ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

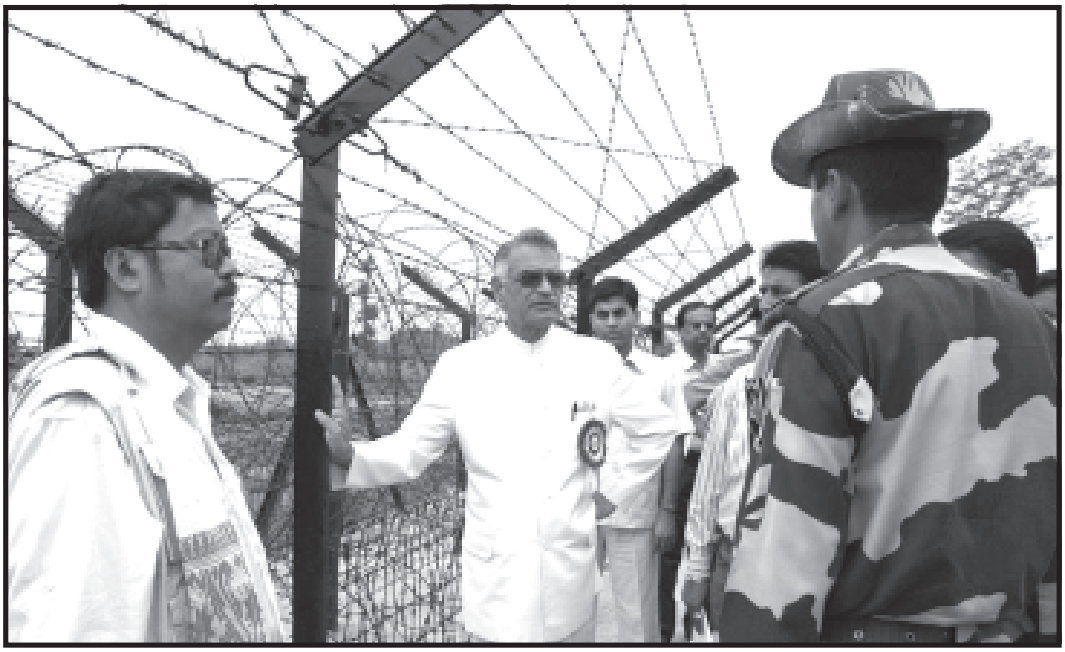

অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জাতীয় সুরক্ষা

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে অনুন্নত ও দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা সর্বজন বিদিত। বিশেষ করে এইসব অনুপ্রবেশ রুজি-রুটির কারণেই ঘটে থাকে। উন্নত দেশগুলি এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়ে যায়। সেইসব রাষ্ট্রে বৈধভাবে আগমন করে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। ওইসব রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশ বিশেষভাবে সজাগ এবং সতর্ক।

কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র এবং উন্নতিশীল রাষ্ট্রে বহুসংখ্যায় বৈধ-অবৈধ অনুপ্রবেশ আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্নে অন্য মাত্রা এনে দেয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বিভাজন এবং ভারতের স্বাধীনতা এক অভূতপূর্ব জনবিন্যাসের সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল, তার ফলে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। হাজার-হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি জবর দখল এবং ধ্বংস করা হয়েছিল, কোটী কোটী মানুষ একবস্ত্রে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই অনুপাতে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের খুব অল্প সংখ্যক মানুষই ভারত থেকে কাঙ্খিত স্বর্গরাজ্য পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে আবার বৈধ-অবৈধ ভাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেই এক আঘাতে ভারতের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই শরণার্থী আগমনকে অনুপ্রবেশ আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের নাগরিকদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন যে পৈচাশিক অত্যাচার করেছিল, সেসময় শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পরও বহু-সংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ও কিছু হিন্দু বাংলাদেশে ফিরে যাননি। ভারত সরকার এইসব দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করেননি অথবা জোর করে সেদেশে ফেরৎ পাঠাননি। তাঁরা ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে মিশে যান এবং নানাভাবে শংসাপত্র যোগাড় করে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নিজেদের দাবি করেন। মানবিক কারণে এই অবস্থাও গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিশাল জনগোষ্ঠি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ মানুষ বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার জেলাগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ফলে ঐসব জেলাগুলিতে সম্প্রদায়গত জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি চয়নে প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ক্ষুদ্র নির্বাচনী স্বার্থে এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন জোগায়। ১৯৭১-এর পর থেকে ক্রমাগত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ আজও অব্যাহত। সরকার এই অনুপ্রবেশের কোনও সঠিক তথ্য দিতে অপারগ, বেসরকারি মতে এই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা তিন-চার কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এক নজরেই এদের চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সাহায্য নিয়ে এঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয় দলিল, যেমন— রেশনকার্ড, বিদ্যালয়ের শংসাপত্র, এমনকি জন্ম বৃত্তান্ত প্রমাণ পত্র ইত্যাদি হাসিল করে নিয়েছে। প্রায় সকলের নামই নির্বাচক তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। ব্যালট বাক্স সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এই প্রক্রিয়ার শরিক হয়েছে। বাংলাদেশ

সরকার এদের একজনকেও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এছাড়াও বৈধ ভিসা নিয়ে এদেশে এসে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই স্বদেশে ফিরে যাননি। সরকারি হিসাবে পাকিস্তানী নাগরিক দশ হাজারেরও বেশি এবং বাংলাদেশী নাগরিক বারো লক্ষের অধিক।

ভারত বর্তমানে অবর্ণনীয় ইসলামিক জেহাদি সন্ত্রাসবাদের শিকার। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশে ঘাটী করে ভারত-বাংলাদেশ অসুরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে ভারতের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদী, অস্ত্র, জালনোট, অর্থ, বিস্ফোরক ইত্যাদি রপ্তানি করছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে সুরক্ষিত থাকায়, ওই প্রান্ত দিয়ে তাদের কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে। কোনওভাবে সীমান্ত পার করার পরই সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশী অধ্যুষিত গড়ে ওঠা গ্রামগুলিতে নিরাপদ আশ্রয়, পথপ্রদর্শক, যানবাহন, মালবাহক ইত্যাদি সবই পাওয়া যাচ্ছে। লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ এ মুহম্মদ, হরকত উল আনসার এবং হুজির কট্টর জেহাদিরা ভারতের সর্বত্র সুপ্ত 'সেল' গঠন করে ফেলেছে। আই এস আই-এর আদেশমতো ভারতের যেকোনও স্থানে ইচ্ছামত সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটানো এখন সহজ ব্যাপার। এইসব অনুপ্রবেশকারীদেরই নয়, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বচ্ছল শিক্ষিত পরিবারের যুবকদেরও জেহাদি চিন্তাধারায় মগজ ধোলাই করে সন্ত্রাসের কাজে লিপ্ত করছে। সিমি এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা অকেজো করে দিতে সক্ষম হয়েছে। জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, আহমেদাবাদ, সুরাট, বেঙ্গালুরু এবং অসমের সাম্প্রতিক ধারাবাহিক বিস্ফোরণ সেই তত্ত্বই প্রকাশ করছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের এক বড় অংশ ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক ও জাল নোট ছড়ানো, খুন, ছিনতাই ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। বাংলাদেশের কুখ্যাত সমাজ বিরোধী সুব্রত বায়েন (ওরফে ফতে আলি) যেভাবে সীমান্ত জেলায় জমি,বাড়ি, সম্পত্তির মালিক হয়ে সীমান্তের উভয়-প্রান্তে তার সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের জাল বিছিয়েছে এক কথায় অভাবনীয়। সীমান্ত জেলায় প্রশাসন, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনীর বিফলতার অকৃত্রিম নিদর্শন। গরুচুরি থেকে নারী-পাচার, জেহাদি পাচার, হেন অপকর্ম নেই যা তারা করছে না। কিছু অর্থের বিনিময়ে সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামের প্রায় প্রতি পরিবারের কিশোর-কিশোরী নারী-পুরুষ বহু মানুষকে এরা ব্যবহার করছে। আই এস আই এবং হুজিও এদের সু-সংগঠিত অপরাধ চক্রকে ব্যবহার করছে। একই সঙ্গে বি এম এস এদের পিছনে ধাওয়া করে গ্রামে প্রবেশ করলে সমগ্র গ্রাম রাস্তায় নেমে বি এস এফ-এর মুণ্ডুপাত করছে। বি এস এফ মহিলাদের উপর নির্যাতন করার জন্যই যেন সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে। বি এস এফ কর্মচারীদের কলঙ্কিত করে তাদের অকর্মণ্য করে দেওয়ার প্রয়াস। প্রায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদ অধ্যুষিত এলাকায় এই প্রক্রিয়াই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পুলিশ, সি আর পি এফ, বি এস এফ, সামরিক বাহিনী কেউই এমন অপবাদ থেকে রেহাই পায় না।

অসমের বোড়ো অঞ্চলে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে গেল। বহুমানুষ প্রাণ হারালেন। আমার বিশ্বাস প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা (কাগজে কলমে ভারতীয় নাগরিক) নিজেদের শক্তি জাহির করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার্থে মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম (মুলফা), মুসলিম লিবারেশন টাইগারস অফ অসম (মুলটা), ইসলামিক লিবারেশন আর্মি অফ অসম, ইউনাইটেড রিফর্মেশন প্রোটেস্ট অফ অসম এবং পিপলস ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অনেক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। উলফা বাংলাদেশের নিমক খেয়ে, অসমের এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। ফলে আগামী দিনে এইসব সংগঠন যখন আরও শক্তিশালী হবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরপত্তা কিভাবে বিঘ্নিত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এত সংখ্যায় এবং এত ব্যাপক অনুপ্রবেশ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপরও চরম আঘাত হানার ক্ষমতা রাখে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রবেশাধিকার সকলের সমান। এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের প্রায় সকলেই এরাষ্ট্রের ভোটার লিষ্টে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন এবং প্রয়োজনীয় শংসাপত্রও তাদের আছে। ফলে নির্দ্ধারিত যোগ্যতার মান প্রদর্শন করতে পারলেই সামরিক বাহিনীর তিন অঙ্গে এবং বি এস এফ বাহিনীতে জওয়ান এবং অফিসার পর্যায়ে কর্মসংস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব। আই এস আই যদি তাদের কট্টর জেহাদি মানসিকতার সদস্যদের এইসব বিভাগে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় তাহলে রাষ্ট্রের সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আশা করব, যে প্রশাসক ভ্রষ্টাচারী হয়ে কিছু অর্থের বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিভিন্ন জাল দলিল গ্রহণ করে ভারতীয় নাগরিক হতে সাহায্য করছেন, যে পুলিশ কর্মচারী এইসব ব্যক্তির বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন না অথবা যে রাজনৈতিক নেতা বিশেষ অনুসন্ধান না করে এদের পরিচিতির এবং চরিত্রের বিষয়ে ঢালাও শংসাপত্র দিয়েছেন অথবা দিচ্ছেন অথবা যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এদের মিথ্যা শংসাপত্র দিয়ে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণে দয়াপরবশ অথবা উৎকোচ নিয়ে সাহায্য করছেন, আশা করব তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করবেন রাষ্ট্রের কত বড় সুদূরপ্রসারী ক্ষতির বিষবৃক্ষ তাঁরা রোপন করলেন। সামরিক বাহিনীতেও এরা বিভিন্ন বিভাগে "সুপ্ত সেল" হয়ে প্রতীক্ষা করবে, কবে আই এস আই-এর আদেশ আসবে কোথায় কখন কিভাবে ভারতের নিরাপত্তার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। আশা করব সেদিন যেন কখনও না আসে।

অনুপ্রবেশের রাজনীতি

- **রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হিসাবেও আজ অনুপ্রবেশকারীরা চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।**
- **গুয়াহাটি আদালতের ভাষায় 'কিং মেকার'।**
- **অসমের ৪৬টি আসনে অনুপ্রবেশকারীরাই নিয়ন্ত্রক।**
- **পশ্চিমবঙ্গের ৫২টি আসন তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।**
- **বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে তারা থাবা বসাচ্ছে।**
- **নিম্ন অসমে মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য 'অটোনমাস কাউন্সিল'-এর দাবি।**

অনুপ্রবেশ ও রাজ্যের সংস্কৃতি-পরম্পরা

নবকুমার ভট্টাচার্য

মাত্র কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক যিনি একজন বড়মাপের লেখকও, তিনি বললেন, তাঁর বাড়ির পাশে কাশী নামে খুব জনপ্রিয় এক দোকানদার ছিলেন। এখন হঠাৎ জানা যাচ্ছে সে হচ্ছে এক বাংলাদেশি মুসলমান, নাম তার কাশেম। কলকাতা পুলিশের হাতে যেসব অপরাধী ধরা পড়ে, দেখা যায় তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে কয়েকবছর আগে এসেছে এমন মুসলমানও আছে। উদাহরণ হিসেবে ক'বছর আগে ধরা পড়া চুন্নু মিঞার নাম বলা যায়, যিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরে এসে আর ফিরে যাননি। চুন্নু মিঞারা এখানে স্থায়ীভাবে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। চুন্নু মিঞার মতো এমনি হাজার হাজার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান কলকাতায় রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ (কাশেম) কাশী সেজে অথবা কেউ স্বনামেই রয়েছেন। প্রশাসন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। এই অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে রেশনকার্ড পেল, ভোটার লিস্টে নাম তুলল, কেউ কেউ আবার পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলে নাম লিখিয়ে একটা বিশেষ অঞ্চলের দাপুটে নেতা হয়ে গেল, তা খতিয়ে দেখে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলে কেউ এমন প্রশ্রয় দিতে সাহস পেত না। কিন্তু সে কাজ করবে কে? ভোট কমবে যে! এই সব ধর্মনিরপেক্ষ দল দশ বছর পরেই আবার আগের মতো ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে বলবে 'আমরা ভুল করে ছিলাম' অর্থাৎ অনুপ্রবেশ সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে মস্ত ভুল করেছিলাম বলে নিস্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু ততদিনে দেশের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই নিত্য দলে দলে বাংলাদেশি মুসলমানের অনুপ্রবেশের ফলে মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া প্রমুখ জেলাগুলির ভাষা সংস্কৃতি ও পরম্পরা বিনষ্ট হতে চলেছে।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একসময় দরিদ্র বাঙালী মুসলমানদের বাস ছিল। কিন্তু আজ বাঙালী মুসলমানদের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে উর্দুভাষী মুসলমানেরা। ফলে সীমান্তের ভাষা বাংলা থেকে উর্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর যে সমস্ত বাঙালী মুসলমানরা বাংলাদেশ থেকে আসছেন তারাও উর্দু সংস্কৃতিতে রপ্ত হয়ে যাচ্ছেন খুব দ্রুতগতিতে। 'মিঞাভাই' 'চাচা', 'বুবু' 'পাণি' শব্দগুলো বাংলা শব্দভাণ্ডারে খুব দ্রুত প্রবেশ করছে। সঙ্গীত সিনেমা নাটকের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রভাব। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলোর সিনেমা এবং ভিডিও হলগুলিতে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের ছবি। এই সব দেখে শুনেই দুই দেশের চিত্রপরিচালকরা যৌথ উদ্যোগে ছবি নির্মাণ করছেন। বর্তমান সময়ে এইসব বাংলাছবির বাজার না থাকায় চিত্র নির্মাতারা কাহিনী বিন্যাসেও অন্যরকম কৌশল অবলম্বন করছেন। বাংলাদেশের কথা ভেবেই ছবির নায়ক হয় মুসলমান আর নায়িকাকে হতে হবে হিন্দু। হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলের প্রেমের গল্প সীমান্তের গ্রাম- গুলোতে বাজারে বিকোয়। এছাড়াও চলে নীল ছবির রমরমা কারবার। রাজ্য পুলিশের মতে পূর্বে খুব গোপনীয় ভাবেই অশ্লীল ছবির শুটিং হতো বারাসত বা বনগাঁর কোনও বাগানবাড়িতে। এখন কলকাতার চাঁদনীচক বা ধর্মতলা অঞ্চলে

বাংলা বিষয়ক যত অশ্লীল ছবির সিডি আসে তার বেশীর ভাগই শুটিং হয় মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা, জলঙ্গী অথবা করিমপুরে। বাংলাদেশের সাদিক ভাই নামে এক ব্যবসায়ী এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা অশ্লীল ছবির সব থেকে বড় চাহিদা চিটাগাঁও অঞ্চলে। সাদিক ভাইয়ের শিলিগুড়ি ও কলকাতা মার্কেটের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে।

কলকাতা টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়াটিকে কব্জা করতেও উঠে পড়ে লেগেছে একশ্রেণীর মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা। মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি একদিন যেভাবে দাউদ ইব্রাহিম বা তার লোকেরা পরিচালনা করতো, আগামী দিনে বাংলা ছবির ধারাটিকেও হয়তো নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীরা। ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এবং এই ঘটনার সত্যতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশী গানের ক্যাসেট ও সিডি পশ্চিমবঙ্গের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। না আববাসউদ্দিন বা সাবিনা ইয়াসমিন্, রুনা লায়লাদের লোকগীতি নয় —চটুল বাংলা গান। পুজোর সময় এবছর কলকাতার প্রায় সব পুজোমণ্ডপে বাজতে দেখা গেছে 'নান্টু ঘটকের কথা শুইন্যা, করলাম একখানা বিয়া' — যা বাঙলা বা বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধী। এছাড়াও সীমান্ত জেলাগুলিতে চলে নিয়মিত মজলিসি জলসা ও কাওয়ালির আসর। মালদা জেলার কালিয়াচকে ও মুর্শিদাবাদের সামরেশগঞ্জ ও ফারাক্কা অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে চলছে হিন্দি চটুল গানের আসর মুজরা। এগুলি অবশ্য একটু গোপনীয় ভাবেই হচ্ছে। নেপাল, বিহার ও কলকাতা থেকে অল্পবয়সী মেয়েরা এই মুজরোতে অংশ নিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল শিক্ষার সঙ্গে সমান তালে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা। আর এ বিষয়ে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার থেকে অস্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন অনুপ্রবেশ হয় এমন জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা ৭৩ হলেও, এই জেলায় অস্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০৮ এবং মালদা জেলায় এই সংখ্যা সরকার স্বীকৃত ৬৮ ও বেসরকারী মাদ্রাসা ১৭২। নদীয়া জেলায় এই সংখ্যা ১৮ ও ৭৮। অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলিতে যা পড়ানো হয় তা বাংলার সংস্কৃতি ও পরম্পরার বিরোধী। মানবতা বিরোধী এই শিক্ষার কুপ্রভাব সমাজে ব্যাপক হারে পড়েছে। এই অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কার্যকরী হয়নি। প্রধানত ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার কারণে যে এমনটা ঘটেছে একথা অস্বীকার করা যাবে না। তাছাড়া রয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ব্যাপক প্রভাব। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মুসলিম শিশুগোষ্ঠীর বৃদ্ধির চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সেইসব জেলাগুলিতে শিশু জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার অত্যধিক বেশি যেখানে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গত পাঁচ দশকে (১৯৫১-২০০১) সেখানে অপরিমিত মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। এই জেলাগুলির অবস্থা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং জেলাগুলি জনসংখ্যার বিচারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অংশ যথাক্রমে ৬৫.৮৬ শতাংশ ও ৩৩.২৪ শতাংশ হলেও শিশু গোষ্ঠীর অংশ যথাক্রমে ৫৫.৪১ শতাংশ ও ৪৩.৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ শিশু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অংশ হ্রাস ও মুসলিমদের অংশের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। সীমান্ত জেলা নদীয়া জেলায় হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অংশ যথাক্রমে ৭৩.৭৫ শতাংশ ও ২৫.৪১ শতাংশ হলেও, শিশু জনগোষ্ঠী ৬৬.৭১ শতাংশ ও ৩২.৫৫ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০০১ জনগণনায় হিন্দু ও মুসলিম জনগণনায় অংশ যথাক্রমে ৩৫.৯২ শতাংশ ও ৬৩.৬৭ হলেও এদের শিশু জনগোষ্ঠীর অংশ যথাক্রমে ২৯.৩৫ শতাংশ ও ৭০.২৭ শতাংশ। অশিক্ষার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতেই মুসলিম শিশু গোষ্ঠীর অপরিমিত বৃদ্ধির চিত্র ভেসে উঠছে। বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশের সুদূরপ্রসারী ফল কত মারাত্মক হতে চলেছে তা আমরা এখনও বুঝতে চাইছি না। একদিকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলত দেশটিকেই অধিকার করতে চাইছে তারা। কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রে এই মস্তক সংখ্যার (ভোটার) দাম অপরিসীম। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আসনের পুনর্বিন্যাস করণের যে খসড়া প্রস্তাব ভারতের ডিলিমিটেশন কমিশন উত্থাপন করেছে দেখা যাচ্ছে সেইসব জেলায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে ব্যাপক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ও অত্যাধিক মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। আসন সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৩টি, উত্তর ২৪ পরগণা ৫টি, নদীয়া ২টি, মুর্শিদাবাদ ৩টি, মালদা ১টি। আসন কমতে চলেছে, কলকাতা, হুগলি সহ হিন্দু প্রধান অঞ্চলের। এরকম চলতে থাকলে অসমের মতো আগামী দিনে কি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা! প্রসাশনের এই অপরিণত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা তাদের কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কর্মধারার অঙ্গ হিসেবে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গাতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের হুমকি দেওয়া হয়;সীমান্তে অবস্থিত হিন্দুর মন্দিরে ঝোলানো হয় গরুর কাটা ঠ্যাং। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ লৌকিক মেলাগুলি বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের তান্ডবে। মৌলবাদীদের তান্ডবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে পুজো পার্বণ আক্রান্ত হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় পরিকল্পিতভাবে ভয় দেখিয়ে বা অর্থের লোভ দেখিয়ে হিন্দু সম্পত্তি ক্রয় করে মসজিদ বানানো হচ্ছে। হিন্দু গ্রামগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে মুসলিম মহল্লায়।

● ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু শতকরা ২৪ ভাগ ছিল। কিন্তু আজ সেখানে ১ শতাংশও নেই। বাকী ২৩ শতাংশ হিন্দু আজ কোথায়? একই ভাবে পূর্ববঙ্গে ১৪ শতাংশ হিন্দু কমে গেছে। অপর দিকে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১৯৪৭ সালে যেখানে ১০.৪ শতাংশ ছিল তা আজ ২০০১ সালে বেড়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। আর হিন্দু জনসংখ্যা ৮৭.২ শতাংশ থেকে কমে ৮০.৫ শতাংশ হয়েছে। তবুও কি হিন্দুরা কট্টরবাদী?

দিনে ভারতে রাতে বাংলাদেশে

অয়ন প্রামাণিক

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন আমাদের সরকারের টনক নড়ার তেমন কোনও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না, তখন ত্রিপুরার সীমান্তের দিবারাত্রির কাব্যটা একবার দেখা যেতে পারে। যেমন বরকত আলির (নাম পরিবর্তিত) কথাই ধরা যাক। সে ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বাংলাদেশের অকুরা নামক গ্রাম থেকে স্ত্রী শেফালী ও দুই মেয়েকে নিয়ে প্রত্যেকদিন সকালে আসে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে। স্থানীয় আসাদ আলি'র কাছ থেকে একটা রিক্সা নিয়ে সে আগরতলার বটতলা মার্কেটে চালাতে শুরু করে। আর সেসময় তার স্ত্রী শেফালী রামনগরের (পার্শ্ববর্তী এলাকা) বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে ঝি-এর কাজ করে আর মেয়ে দুটো রামনগরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। খদ্দের পেতে নাকি অসুবিধে হয় না। বরকত কখনও কখনও দিনমজুরেরও কাজও করে। সবাইকে বলা আছে দিনশেষে বটতলা মার্কেটে জড় হতে, তারপর সারাদিনের উপার্জন গুণে নিয়ে পরের দিনের জন্য খাবার-দাবার কিনে ১ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ ফিরে যাওয়া।

আর একটা গল্প, হারাধন দাস আগরতলার রিক্সাচালক, তিনি নাকি রিক্সাচালানো ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করার কথা ভাবছেন। তার ক্ষোভ, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা প্রতিদিন ভারতে ঢুকে রিক্সা চালিয়ে তাদের পেটের ভাতে ছোবল মারছে। তার আরও দাবি ভারতীয়রা রেজিষ্ট্রেশন করানো রিক্সা টানে। প্রায় ২৭ শতাংশ রিক্সাচালক আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (AMC) থেকে নথিভুক্ত। যদিও (AMC) ছবিসহ পরিচয়পত্র দিয়েছে তবে তা খুব একটা কাজে লাগছে না।

এই হল ত্রিপুরা সীমান্তের অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষের রোজনামচা। সেখানে দলে দলে বাংলাদেশীরা প্রতিদিন ভারতে ঢুকছে। তাদের দিন শুরু হচ্ছে ভারতেই জলখাবার খেয়ে। দুপুরের খাওয়াও এখানে। আর রাত্রিতে বাংলাদেশ বর্ডার পেরিয়ে নিজেদের ডেরায় ফেরা। আবার পরের দিন সকালে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে দিন শুরু করা। বটতলা মার্কেটের এক ভ্রাম্যমান চা-দোকানী অজিত দাসের কথায়, 'প্রচুর বাংলাদেশী দিনমজুর এখানে আসে, আমার দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে আবার চলে যায়। যদিও তাদের সংখ্যা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরে কমেছে।

ত্রিপুরার বাংলাদেশের বর্ডারে ৮৫৬ কিমি বেড়া দেওয়া সত্ত্বেও এই অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বি এস এফের এক পদস্থ অফিসারের বক্তব্য হল — 'আমরা সীমান্ত গ্রামগুলিতে কড়া নজর রেখেছি তবুও সীমান্ত গ্রামগুলি খুব কাছাকাছি হওয়াই উভয় গ্রামবাসীদের (ভারতীয় ও বাংলাদেশী) মধ্যে পার্থক্য খোঁজা কঠিন। বেড়া হয়তো কিছু অনুপ্রবেশ কমিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশী বরকত আলিরা এখনও ঢুকছে।

ঘটনার ঘনঘটা

(১) অসমের উদলগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় বোড়ো সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক মানুষ নিজেদের আশ্রয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছে (September, 2008)। এমনকী বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সাথে বোড়োদের ভয়াবহ দাঙ্গাও হয়ে গেছে।

(২) কলকাতা পুলিশ মহম্মদ জিয়া নামে একজন বাংলাদেশীকে গার্ডেনরীচের রামনগর থেকে গ্রেপ্তার করে। যে নাকি ১৫ জুন জওহরলাল নেহেরু রোডের এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে, ৩০ জুলাই লেনিন সরণীর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার' ব্রাঞ্চে চুরি করার চেষ্টা করে।

যদিও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ত্রিপুরায় যতটা প্রভাব ফেলছে, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব অসমে লক্ষণীয়। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী এখন অসমে থাকে, যারা অনুপ্রবেশ করেছে প্রমাণসাপেক্ষ ভাবে, এবং অসমের স্থানে স্থানে মেজরিটিতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অজয় বিশ্বাস বলছেন, বাংলাদেশীরা বছরের পর বছর ধরে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিদিনের কাজের জন্য ভারতে প্রবেশ করছে কারণ বাংলাদেশের সীমান্ত গ্রামগুলোতে পরিকাঠামো শোচনীয় ভাবে দুর্বল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে এখানে থেকেই গেছে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে স্বাধীনতার আগে ত্রিপুরা রাজাদের শাসনে চলত। আর সেই মহারাজারা যেসব অঞ্চ ল শাসন করতেন তার বেশ কিছু বর্তমান বংলাদেশে পড়ছে। স্বভাবতই ওই দেশের লোকেদের সাথে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায়

বনগাঁর কাছে কল্যাণীতে বাংলাদেশ সীমান্ত।

আছে। আর তাই এই হাজার লোকের ভিড়ে বাংলাদেশী আলাদা করে খোঁজা দুষ্কর। কারণ তাদের দেখতে একরকম, খ্যাদ্যাভ্যাস এক, পোশাক-আশাক একইরকম। এমনকী একই ভাষায় কথা বলে।

অকুরা গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা এই বাংলাদেশীদের বাধ্য করছে ভারতের গ্রামগুলিতে সীমানা পেরিয়ে চোরাপথে পা রাখতে। অন্যদিকে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী এলাকায় স্মাগলিং-এর কারবার বেড়েই চলেছে। এমনকী উভয় সীমান্তের অধিবাসীরাই বেআইনী পথে উলের পোশাক থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় এক চোরাচালানকারী হাসিম মিঞা'র কথায়, সীমান্ত গ্রামগুলিতে দেওয়া-নেওয়ার চোরা-কারবার প্রতিদিনের ঘটনা। যদিও দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা (BSF ও BDR) ইদানিং আমাদের চাপ দিচ্ছে বেশী। হাসিমের মতো

সীমান্তে পারাপার চলছে।

লোকেদের কাছে সীমান্ত পেরোনো জলভাত। যে নাকি জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশে একটি বাড়িও আছে বাংলাদেশের পাসপোর্টও আছে। স্থানীয় বিধায়ক আবার মনে করছেন শাসকদলের রাজনৈতিক চাপই উত্তর-পূর্ব ভারতীয়দের ভাতের থালায় বাংলাদেশীদের ভাগ বসাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে! স্থানীয় MLA সুদীপ রায় বর্মণ বলেছেন, 'পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে স্থানীয় শাসক রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে ও তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারে। আমরা দেখছি হাজার হাজার ভোটার যাদের আই কার্ড আছে, বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও তাদের নাম আছে। এই ঘটনায় একটি নোটিশ নির্বাচন কমিশনকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে High Court স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ''Bangladeshi nationals who have illegally migrated to India or trespassed, have no legal right of any kind to remain in the country and are liable to be deported. The order of deportation is not punishment, but a method of ensuring the return to his own country of an alien who has not complied with conditions '' (The Times of India Aug 14,08).

আরও চাঞ্চ ল্যকর ঘটনা হল, বাংলাদেশী গুন্ডারা স্থানীয় শাসকদলের রাজনীতিতে বেশ কাজে লাগছে। মামুদ মিঞা হল এমনই একজন যার আবার HUJI'-র সাথে সক্রিয় যোগাযোগ আছে। অনেক বাংলাদেশী আছে যারা একবার সঠিক পাসপোর্ট দেখিয়ে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু তাদের সেই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হলেও তাদের আবার বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার কোন খবর নেই। এই হল গা ছমছমে সীমানার ছবি। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য যাদের কষ্টে বুক ফেটে যায়, তারা একবার তাকিয়ে দেখুন হারাধন দাসদের ভাতের থালায় আর কতদিন অনুপ্রবেশের ছোবল পড়বে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা আর কতদিন নোংরা Vote Bank-এর রাজনীতি করবেন!

দিল্লীতেও বাংলাদেশী বসতি

শঙ্কর পাল

দিল্লীর জামিয়ানগর। একদিন সকালে সরজমিন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে এক সাংবাদিক সেখানে খাটিয়ায় বসে থাকা একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন — আপনার নাম কী? চটজলদি উত্তর — কামালুদ্দিন। হিন্দীতে আড়ষ্টতা, কারণ সে বাংলাভাষী। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতরে খোদ রাজধানী দিল্লীতেও জাঁকিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। দক্ষিণ দিল্লীর শাহিনবাগ, জামিয়ানগর, কালিন্দীকুঞ্জ, ওলা, শাস্ত্রী পার্ক, সীলমপুর, তাহিরপুর, নন্দনগরী, সীমাপুরী, মদনপুর, জাহাঙ্গিরপুরী এবং শাহআলম্ বাঁধ এলাকায় বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের কলোনী গড়ে ওঠেছে। রাজধানী দিল্লীতে লক্ষাধিক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রয়েছে বলে নরসিমা রাও-এর মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী খোদ সলমন খুরশিদ নিজেই সংসদে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

রাজধানী দিল্লীর কুড়িটি বিধানসভায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভোটাররা নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে — এই মর্মে কিছুদিন আগে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বেশ কয়েকবার দিল্লী হাইকোর্ট (জনস্বার্থ মামলায়) দিল্লী রাজ্য সরকারকে প্রতিদিন শতাধিক অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কারের নির্দেশও দিয়েছে। তবুও নানা টালবাহানা করে শীলা দীক্ষিত সরকার অনুপ্রবেশকারীদের পরোক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে।

অতি সম্প্রতি দিল্লী হাইকোর্ট এক যুগান্তকারী রায়ে বলেছেন — ''Bangladeshi nationals who have no legal right of any kind to remain in the country and are liable to be deported. The order of deportation is not a punishment, but a method of ensuring the return to his own country of an alien who has not compiled with conditions.'' (The Times of India - 14th August, 08)।

রাজিয়া বেগম নামে জনৈকা বাংলাদেশী মুসলিম মহিলা দিল্লী হাইকোর্টে তার বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করলে দিল্লী হাইকোর্ট উপরোক্ত আদেশ দেয়। উল্লেখ্য, রাজিয়ার পরিবারের অন্য পাঁচজনের বিরুদ্ধেও একই রকম বহিষ্কার-এর নির্দেশ ছিল। এ ঘটনা দিল্লীতে বাংলাদেশী মুসলমানদের অবস্থানের এক জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

দক্ষিণ দিল্লীর সরিতাবাগের পাশেই শাহিনবাগের মুসলিম (বাংলাদেশি) কলোনি। এক নোংরা নালার পাশে ঝুপড়ির সারি। সেখানেই খাটিয়ায় বসা কামালুদ্দিনের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তাকে আবারও প্রশ্ন — কী কাজ কর? উত্তরে কামালুদ্দিন জানাল যে, সে প্লাস্টিকের বাসনপত্র ফেরি করে বিক্রি করে। সে অকপটে আরও জানাল — তার মূল বাড়ি বাংলাদেশে। ওই বস্তিগুলোতে হাজারে হাজারে বাংলাদেশী মুসলমান বছরের পর বছর বসবাস করছে। যেমন শবনম্। নিজের ঝুপড়িতে বসে সে রাঁধছিল। সে কিন্তু তার বাংলাদেশী পরিচয় প্রকাশ করেনি। ফাঁকা সরকারি জমি, ফুটপাত, মহল্লার অলি-গলি, যমুনা নদীর চর বা তীরে প্রথমে এরা পলিথিন টাঙিয়ে থাকতে শুরু করে। পরে একটা ঝুপড়ি তৈরি করে নেয়। হঠাৎ করে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথা থেকে এসেছ?'

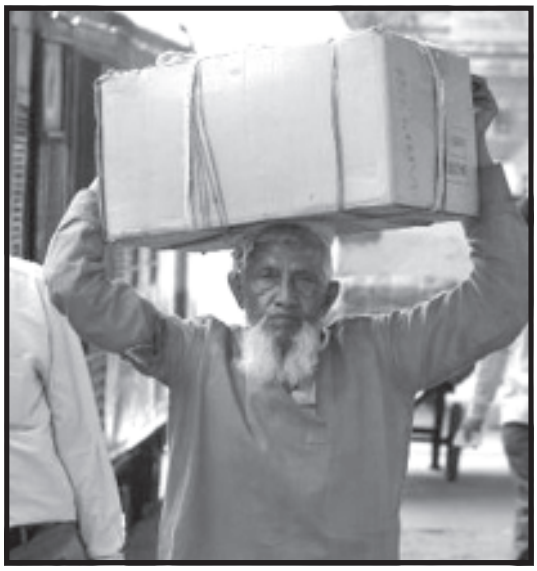

মুটের কাজে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী।

চটপট উত্তর —পাশ্চিমবাংলা থেকে। অথবা বলবে, মালদা, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নাম। যেহেতু এরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলে, সাধারণভাবে লোক তাই ধরে নেয় ওরা বুঝি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এসেছে। কিন্তু যারা জানেন তারা ভালো করেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কথ্য ভাষা আলাদা। উচ্চারণে অনেক পার্থক্য। দিল্লীতে এইসব বাংলাদেশীরা দিনে ছোটখাটো কাজ করে আর রাতে কিছু অন্যরকম কাজকর্ম করে। এদের কিছু লোক রিক্সা চালায়, ময়লা আবর্জনা ঘেঁটে ছোটখাটো জিনিসপত্র কুড়োয়, আবার বেশকিছু লোক বাসে-ট্রেনে পকেটমারি করে। সন্ধ্যা হলেই পেশা বদলে যায়। পথযাত্রীদের লুটপাট থেকে ডাকাতি করাটাও জলভাত। বিগত চার -পাঁচ বছরে ডাকাতির যেসব ঘটনা ঘটেছে তার যেটুকু তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে — দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা জড়িত। পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নিক বা না নিক ভুক্তভোগীদের কথায় বাংলাদেশীরাই লুটপাট করেছে। এরকম একজন ভুক্তভোগী দরিয়াগঞ্জের প্রভাত প্রকাশন-এর মালিক শ্যামসুন্দরজী। প্রীতবিহারে শ্যামসুন্দরজীর বাড়িতে ২০০২ সলের নভেম্বর মাসে ডাকাতি হয়েছিল। ডাকাতির সময় ডাকাতরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলছিল। পুলিশ কয়েকজন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করলেও কারও সাজা হয়নি।

দক্ষিণ দিল্লীতে হত্যা, ডাকাতি নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্য, ওই সব ঘটনায় বাংলাদেশীরা জড়িত থাকতে পারে। তবে তাদেরকে যারা আড়ালে থেকে পরিচালনা করছে তাদের ভাবনা-চিন্তা কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা স্থানীয় গুণ্ডা, মস্তানদের সঙ্গে যোগসাজস করে লুঠের মাল কম দামে (প্রায় এক চতুর্থাংশ দামে) কিনে বা হাতিয়ে নেয়। এই পরিস্থিতি হল ওখলা, জামিয়ানগর, হমদর্দনগর, শাহিনবাগ প্রভৃতি মুসলিমবহুল এলাকার। দক্ষিণ দিল্লীতে বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় বাড়ি রয়েছে। ওইসব বাড়িতে অনেক বয়স্ক লোকেরা থাকেন। তাদের নিকট আত্মীয়রা দেশের অন্যত্র চাকরি ব্যবসা করেন অথবা বিদেশে থাকেন। সেজন্য তাঁদেরকে চাকর-বাকর বা কাজের লোকে উপরই নির্ভর করতে হয়। ওইসব বাড়ির কাজ করে ঝুপড়িবাসী বাংলাদেশী মহিলারাই। ওই কাজের লোকেদের মাধ্যমে খবরা-খবর নেয় বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরা। আবার ওইসব বাংলাদেশী মুসলমান মহিলারা হিন্দু নাম নিয়ে (বিমলা, কমলা, সুশীলা, সারদা প্রভৃতি) কাজের খোঁজ করে। কাজ জুটিয়ে নেয়।

২ নভেম্বর রাতে সুখদেব বিহারের ৮১ নং বাড়িতে ডাকাতি ও বাড়িওয়ালা এম এস গুলটির হত্যা এরকমই এক যৌথ ষড়যন্ত্র বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। স্থানীয় তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক নেতারা এইসব বাংলাদেশী মুসলিমদের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সবরকম সাহায্য করে থাকে। ওই সেকুলার রাজনৈতিক নেতাদের মদত পেয়ে বাংলাদেশীরা কাউকে পরোয়া করে না। লাগোয়া হিন্দুবহুল এলাকার সরিতা বিহারের হিন্দু বাসিন্দারা ওই বাংলাদেশি ও তাদের মদতদাতা স্থানীয় দুস্কৃতীদের বাড়াবাড়িতে অস্বস্তিবোধ করছে। গত ৪ নভেম্বর এল ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ডে গরুর বাচ্চার মাথা পাওয়া গিয়েছিল। একাজ যে কোনও হিন্দুর পক্ষে করা অসম্ভব তা হলফ করে বলা যেতে পারে। সকালে পুরোহিতরা চেঁচামেচি করে পাড়ায় সকলকে খবর দেন। ছটপূজার দিনে এরকম ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ এসে ৭২ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তারের কথা দেওয়ায় হিন্দুরা শান্ত হয়। কিন্তু দুস্কৃতীরা এতটাই বেপরোয়া যে, দুদিন বাদে ৬ নভেম্বর আবারও নিকটবর্তী যশলা এলাকায় পাঁচটি গরু কাটা হয়। এপ্রিল মাসে সরিতাবিহার-এ দু'ডজন গরু কাটা হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের বক্তব্য, এ সব কাজ কয়েকজন নেতা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে করাচ্ছে। দিল্লীর ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতেও বাংলাদেশীরা 'ঘুসপেট' করে পৌঁছে গেছে। যদিও স্থানীয় লোকেদের বিরোধিতায় ওখানে থাকতে পারছে না।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, দিল্লী এবং দিল্লীকে ঘিরে চারদিকে বাংলাদেশী মুসলমানদের বসতি গড়ার কাজ সুপরিকল্পিত ভাবে চলছে। দিল্লী থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সবুজ করিডর তৈরির ছক করেছে। অত্যন্ত সুচারুভাবে কত বাংলাদেশী কোথায় কীভাবে ঘাঁটি গেড়ে থাকবে, তাদেরকে কে বা কারা কাজ যোগাড় করে দেবে ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গেছে, এর পেছনে একটি চক্র কাজ করছে। বাংলাদেশীদের প্রথমে ধুবড়িতে এনে কিছুদিন রাখা হয়। তারপর হিন্দী বলার অভ্যাস করানো হয়। হিন্দী রপ্ত হওয়ার পর ট্রেনে করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। আমাদের দেশে মসজিদে পুলিশ ঢোকে না, আর তাই বড় বড় মসজিদ তৈরি হচ্ছে। সেখানে একসঙ্গে অনেক লোক থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কলকাতার রাস্তা তো রোজার মাসে, ঈদের দিনে মুসলমানদের দখলে চলে যায়। পুলিশ তাদের পাহারা দেয়। কর্মব্যস্ত দুপুরে রাস্তা জুড়ে ঈদের নমাজ পড়া ক্যানিং স্ট্রীটের মতো ব্যস্ত রাস্তাতেও হয়ে থাকে।

দিল্লীমুখী ফরাক্কা এবং মহানন্দা এক্সপ্রেসে ওইসব বাংলাদেশীদের দিল্লীতে পাঠানো হয়। ফরাক্কা এক্সপ্রেসের একজন টিকিট পরীক্ষক জানিয়েছেন, ওই বাংলাদেশীদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টিকিট থাকে না। যদি ধরা হয় তাহলে ওরা সানন্দে জেলে যেতে রাজি হয়। প্রায় ২০০০ কিলোমিটার ট্রেন যাত্রা বিনা পয়সায় করে থাকে।

দিল্লীর সীমাপুরীও বাংলাদেশীদের আর একটা বড় আস্তানা। ওখানে থেকে বাসে চড়ে বাংলাদেশী মহিলারা ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করতে বিভিন্ন জায়গায় যায়। পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় এ সব বিনা বাধায় চলছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। ২০০৩ সালেই দিল্লী হাইকোর্ট প্রতিদিন একশ জন বাংলাদেশীকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিল। অবস্থা কিন্তু সেই তিমিরেই। দেশের মানুষের নির্বিঘ্নে বসবাসে অসুবিধা তো হচ্ছেই। একই সঙ্গে বিপদ বাড়ছে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও। ●

অনুপ্রবেশ রোধ ঃ শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছাই হাতিয়ার

এন সি দে

ঢাকাতে অনুষ্ঠিত ২৮-তম ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার কোঅর্ডিনেশন কনফারেন্স থেকে ফিরে বি. এস. এফ প্রধান এ কে মিত্র কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন যা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৭২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ১২ লক্ষ বাংলাদেশী প্রামাণ্য নথিপত্র নিয়ে ভারতে ঢুকে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। শ্রীমিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেই এই তথ্য জানিয়েছেন। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা সরকারি এই তথ্য অনুযায়ী দু'কোটির কাছাকাছি এবং তা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ বেআইনী বাংলাদেশীই কেবল অসমে বাস করছে এবং রাজ্যের পাঁচটি সীমান্ত জেলাতে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে। এটা খুবই চিন্তার কথা যে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর দল অসম ও তার সন্নিহিত দেশগুলির উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চ লগুলিকেও জন-প্লাবিত করে দেবে।

Illegal Migrants Determination by Tribunals (IMDT) Act-এর আনুকূল্যে সরকারি অধিকারীদের নাকের ডগায়ই এইসব ঘটছে। কিন্তু এই আইন তুলে দেওয়ার পরও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কল্যাণে বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর কাজ যতটা দ্রুততার সঙ্গে করা উচিত তত দ্রুত করা হচ্ছে না বলেই গত ২৩ জুলাই, ২০০৮ গুয়াহাটি হাইকোর্ট এক রায়ে বলেছেন যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই এখন রাজনৈতিক পালা বদলের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। হাইকোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলা হয়েছে যে অসমকে বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে তোলাটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। এই রায়টি দেওয়া হয়েছিল ৬১ জন আবেদনকারীর আবেদনের নিষ্পত্তি মামলায় তাদের নিজ নিজ ট্রাইবুনালের ভিত্তিতে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিতকরণের সময়।

এইরকম একজন অনুপ্রবেশকারী হল মহঃ কামালুদ্দিন যার হাতে ছিল পাকিস্তানী পাসপোর্ট যা নিয়ে সে বাংলাদেশ হয়ে অসমে গিয়েছিল এবং সেখানে ১৯৯৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর তরুণ গগৈ হাইকোর্টের বিচারপতির এই অভিমতকে নিন্দা করেছেন। তবে গগৈ-এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল কামালুদ্দিনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া। এর আগে ২০০৫ সালে IMDT ট্রাইবুনালের বিদায়ী বিচারপতিও একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

আদালতের এই অভিমত অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (AASU)-র মতো রাজনৈতিক দলগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে ''বাংলাদেশী বিতাড়ন' আন্দোলন নামার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। এদের কর্মীরা অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সঙ্গে মিলে শতশত বাংলাদেশীকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চ ল থেকে ধরে পুলিশের হাত তুলে দেয়।

এইভাবে বেড়ে চলা বেআইনী অনুপ্রবেশ-এর ফলে অসমে এক সামাজিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে। এরই পরিণাম হল উত্তর অসমের উদলগুড়ি জেলার সংখ্যালঘু ছাত্রদের ডাকা ১২ ঘন্টার বনধ্‌কে ঘিরে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে দুইজন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, এই বেআইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা যেকোনও উদ্যোগকেই সাম্প্রদায়িক রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়। বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বাধীন Assam United Democratic Front (AUDF) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছে যে বিদেশী ঠেকাতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিলে তিনি চুপ করে থাকবেন না।

AUDF কার্যকরী সভাপতি হাফিজ রসিদ চৌধুরী বলেছেন, ভারত সরকারের উচিৎ বাংলাদেশ সরকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদেশী বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তিতে সই করানো। ভারত সরকার এই কাজে বাংলাদেশের পিছনে লেগে আছে কিন্তু এখনও সফল হয়নি। বাংলাদেশ সরকার তো প্রথমত বেআইনী বাংলাদেশী ভারতে আছে একথাই স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত, এই চুক্তি হলে তো বাংলাদেশের মাটিতে যেসব ভারতীয় রাষ্ট্রবিরোধী নেতারা আছেন তাদেরও ফেরৎ পাঠাতে হবে। সেই কারণে বাংলাদেশ সরকার এই চুক্তি করতে রাজি নয়।

বেআইনী অনুপ্রবেশের সমস্যা দিনকে দিন বাড়ছে। বেআইনী অনুপ্রবেশকারীরা আর কয়েকটি বড় বড় শহর ও শহরাঞ্চ লেই সীমাবদ্ধ নেই। তারা এখন গ্রামাঞ্চ ল ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চ লেও ঢুকছে।

> **“দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, এই বেআইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা যেকোনও উদ্যোগকেই সাম্প্রদায়িক রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়।”**

অসমকে বেআইনী অনুপ্রবেশ গ্রাস করেছে। কার্বি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর সভাপতি স্টেলিন ইংটির মতে, প্রায় ১ লক্ষ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী কার্বি-অ্যাংলং জেলাতে বসবাস করছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের সমস্যা এখন অসমের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আসু (AASU), Karbi Students Union (KSU) ও All Dimasa Students Union (ADSU) নামক দুটি উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যাতে এই সমস্যার বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই করা যায়। আপার অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ানোর ফলে তাদের মধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশী মুসলিম অধ্যুষিত ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়, মরিগাঁও এবং নওগাঁও মত লোয়ার অসমের কিছু অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। এখন মেঘালয়ের সমতল অঞ্চলেও এদের একটি বড় অংশ ঢুকছে। গারো স্টুডেন্ট্স্ ইউনিয়নের মতে, সমতল অঞ্চল বিশেষ করে ফুলবাড়ি, রাজাবালা, মহেন্দ্রগঞ্জ ও টিকড়িকিল্লা অঞ্চলে এরা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বাংলাদেশীরা এই সীমান্ত অঞ্চলে তাদের ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করেছে। এরকম বহু ঘটনার উদাহরণ রয়েছে যেখানে বাংলাদেশীরা সীমান্ত অঞ্চলের এদেশের মেয়েদের বিবাহ করে মেঘালয় সরকারের কাছ থেকে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। অসমের মত ঘটনা যাতে না ঘটে, Garo Students Union (GSU) তাই শুরুতেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের খেদিয়ে তাড়ানোর অভিযান শুরু করার হুমকি দিয়ে রেখেছে।

অসম এখন অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ দ্বারে পরিণত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য যথা — মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ে ঢুকে পড়ছে। অনুপ্রবেশকারীরা সরাসরি ত্রিপুরার দিকে প্রথমে যায় কারণ এটা বাংলাদেশের লাগোয়া এবং সীমান্তের অনেক এলাকাই উন্মুক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ রুখতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হল সীমান্তে বেড়া দেওয়া। এই বেড়া দেওয়ার কাজ এখন প্রায় শেষ। যদিও বেড়া দিয়েও পুরোপুরি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়নি, তবে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অবশ্যই গেছে। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের ৮৬০ কি. মি সীমান্তের মধ্যে ৭০০ কি. মি বেড়া দেওয়া হয়েছে। আর বাকি এলাকায় শীঘ্রই বেড়া দেওয়া হবে। এর ফলে সীমান্তে আইন শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আগে সেখানে বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রায়ই ভারতের দিকের গ্রামগুলোর উপর হামলা চালাত। ভারতের সঙ্গে সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৪০৯৬ কি.মি দীর্ঘ, এর মধ্যে ১,১১৬ কি.মি নদীবেষ্টিত। সীমান্ত অঞ্চল টহল দেওয়া তাই একটি দুরূহ কাজ। ভাসমান সীমান্তে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা শুরুই করা যায়নি। এর জায়গায় চত্রণ্ঠ স্পীড বোট ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার দুটি India Reserve Battalions (RAB) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা নদীবেষ্টিত সীমান্ত পাহারায় লাগানো হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উন্নত টহলদারি কিছুটা কাজ দিয়েছে। চত্রণ্ঠ সীমান্তে উন্নত টহলদারি কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। চত্রণ্ঠ প্রধান সম্প্রতি বলেছেন যে ২০০৭-এ ৮০৭ জন বেআইনী অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে সীমান্তে, পাঁচ বছর আগে যেখানে এই সংখ্যাটা ছিল কয়েক হাজার।

তবে শত বাধাও বাংলাদেশীদের সীমানা টপকানো আটকানো বন্ধ করতে পারেনি। অনেকে আবার সমুদ্র পথেও আসছে। উড়িষ্যার মত রাজ্যেও তারা ঢুকছে নৌকা করে। উড়িষ্যার বহু জেলাতে আজ বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বর্তমান। কেন্দ্রপাড়া, নয়ারঙপুর, মালকানগিরি, ভুবনেশ্বর, পুরী, চিলকা, গঞ্জাম, বালেশ্বর, কেওনঝড় ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করছে।

বাংলাদেশীরা এখন বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবাংলায় এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর দল কয়েক বছর ধরে নন্দীগ্রামসহ গ্রাম বাংলায় ঢুকে পড়েছে এবং এলাকার বামপন্থী নেতাদের সাহায্যে ভাগচাষী হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে পাকাপাকি গেড়ে বসেছে। বিহারের বেশ কিছু জেলাও এই একইভাবে আক্রান্ত।

আমাদের সীমান্তরক্ষীরা কেবল সীমান্তই প্রহরা দিতে পারে যা খুবই কঠিন কাজ, কারণ আমাদের সীমান্তগুলি অনেক স্থানেই উন্মুক্ত। প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া এই বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ অসম্ভব। প্রায়ই দেখা যায় অসামরিক প্রশাসন চত্রণ্ঠ কে সাহায্য না করে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদেরই সাহায্য করছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভারতে ঢোকার আগেই তাদের কাগজপত্র তৈরি করে রাখা হয়েছে। সীমান্তে দালালরা মাত্র ৭০০ টাকায় এদের সমস্ত ধরনের পরিষেবা দিচ্ছে। এমনকি চত্রণ্ঠ এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের পাকড়াও করলেও এইসব দালালরা আইনি বাধা দিচ্ছে এবং অসম ও পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলাগুলিতে বাংলাদেশীরাই শক্তিশালী হওয়ায় আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। চত্রণ্ঠ জওয়ানদের অভিযুক্ত করে ণ্ঠচত্ম দায়ের করছে। এইকাজে বাংলাদেশীদের সাহায্য করছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাই।

অতএব বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের সমস্যা ইতিমধ্যেই আমাদের একটি ভীতিপ্রদ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা বেশ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্যই নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কারণ এই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অনেকেই ভারতে বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এরা জড়িত। হুজি ও লস্কর-ই তৈবার গোপন সেলের কাজে এরা যুক্ত। ISI এবং DGFI-এর নির্দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই ভয়াবহ বিপদের বিরুদ্ধে সকলের মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের এটাই প্রকৃষ্ট সময়।